আত্মকথা

Association of Adoptive Parents-এর মুখপত্র

atmaja

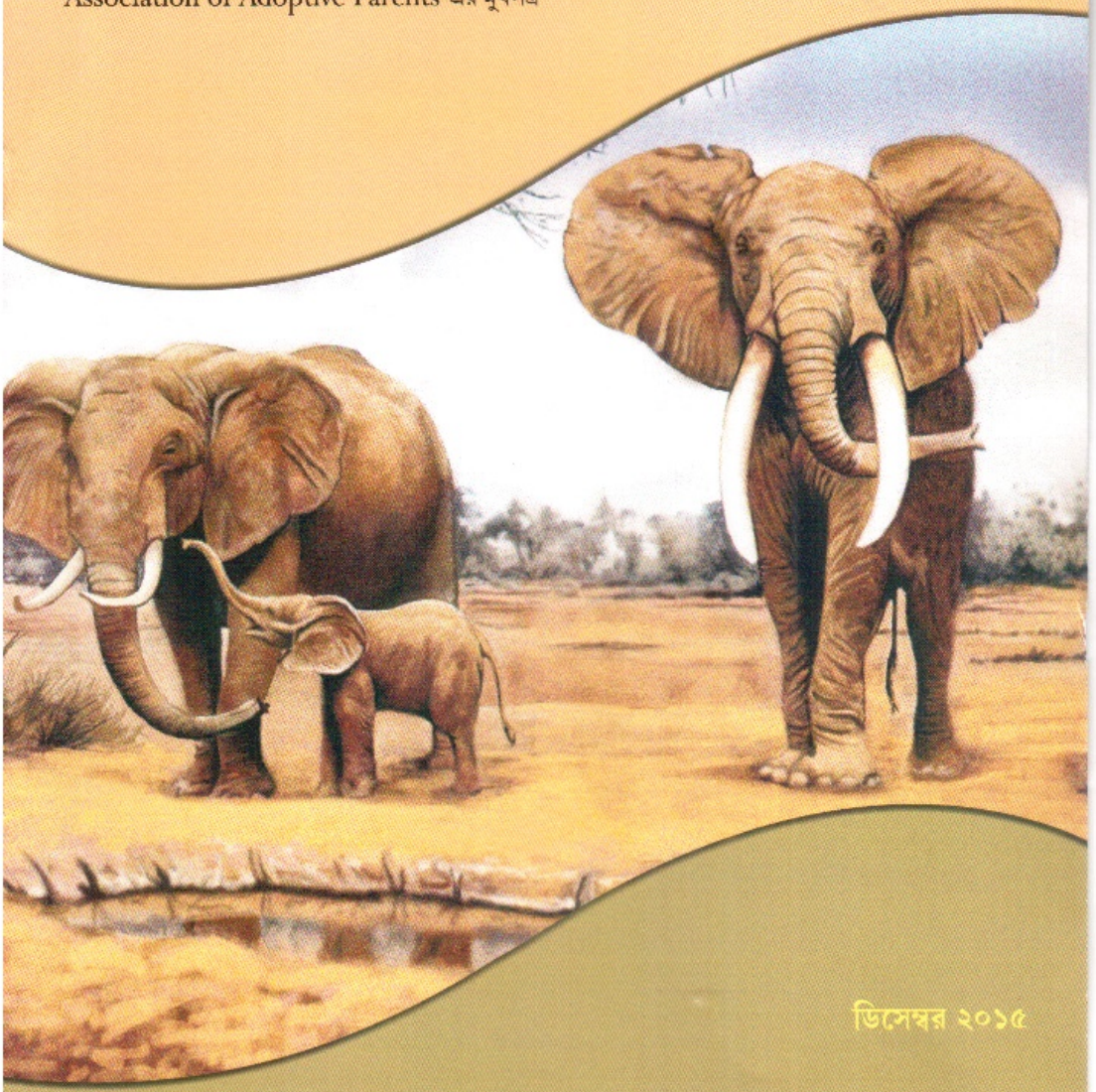

ডিসেম্বর ২০১৫

atmaja

Chairperson
Sheemantika Nag

Vice-Chair
Anup Dewanji

Secretary
Subir Banerjee

Asstt. Secretary
Sankar Naskar

Treasurer
Sanjay K. Sikdar

Member
Nilanjana Gupta
Anjan Basu Chowdhury
Achin Basu
Sharmishtha Roy
Subha Mukherjee
Satabdi Das
Nilanjana Dasgupta
Debashish Roy
Prabhat Kumar Chattopadhyay

atmakatha

Editor
Gautam Gupta

Editorial Board
Swapan Naskar
Satabdi Das
Anup Dewanji
Sanjay K. Sikdar

সম্পাদকীয়

আমাকে আমার মতো থাকতে দাও

এক কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি আমরা। সারা দেশে বয়ে চলেছে অসহিষ্ণুতার ঝড়। নিরন্তর আক্রান্ত হচ্ছে যুক্তিবাদী চিন্তা, ধর্ম নিরপেক্ষতা আর বিজ্ঞানমনস্ক ভাবনার পথ। ছুটছে গোঁড়ামি, কুসংস্কার আর বিভেদের বিজয় রথ।

শুধুমাত্র বিজ্ঞান মনস্কতার পক্ষে ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লেখার জন্য খুন হয়ে যান প্রখ্যাত লেখক নরেন্দ্র দাভোলকর, গোবিন্দ পানেসার এবং এম. এস কালবুর্গী। উত্তরপ্রদেশের দাদরিতে গরুর মাংস খাওয়ার মিথ্যে গুজব ছড়িয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয় মহম্মদ একলাখকে। পাকিস্তানি লেখকের বই প্রকাশ অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য জুতোর কালি মাখিয়ে দেওয়া হয় সুধেন্দ্র কুলকার্ণির মুখে। আর কত বলব। ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচের প্রস্তুতি পর্বের মিটিং-এ হলঘর ভাঙচুর হয়। শাহরুখ খানকে বলা হয় পাকিস্তানে গিয়ে সিনেমা করতে। আমির খানের স্ত্রী কিরণ রাও আর্তনাদ করেন, 'আমরা কি এই দেশে থাকতে পারব'! তাঁর সঙ্গে আমারও চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা হয়, 'এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ নয়, এই জহ্লাদের উল্লাস মঞ্চ আমার দেশ নয়'।

প্রতিবাদ তবু জেগে থাকে। প্রথমে সাহিত্যিকরা। নয়নতারা সেহ্গাল, অশোক বাজপাই, সারা যোশেফ, মন্দাক্রান্তা সেন-রা আকাদেমী পুরস্কার ফিরিয়ে দেন। এরপর চিত্রশিল্পীরা। ভিভান সুন্দরম, নিলীমা শেঠ, অঞ্জলি এলা মেনন ও সুধীর পট্টবর্ধন সহ অন্তত ৩০০ শিল্পী। তারপর বিজ্ঞানীকুল। প্রথিতযশা বিজ্ঞানী অশোক সেন, মাদাবুসি রঘুনাথন, ও পি. বলরাম সহ ১২৩ জন বিজ্ঞানী চিঠি দেন রাষ্ট্রপতিকে।

* * * * *

'আত্মকথা'-র পক্ষে স্বপন নস্কর কর্তৃক ৫১৭ যোধপুর পার্ক, কলকাতা-৭০০০৬৮ থেকে প্রকাশিত এবং 'অ্যাফ্রোদিতি' ১/২৫৪, নাকতলা, কলকাতা-৪৭ থেকে মুদ্রিত।

আত্মকথা-র পাতায় এই সব কথা কেন? কারণ আমরা দত্তক মা-বাবারাও এক ধরনের অসহিষ্ণুতার শিকার। গোঁড়ামি, কুসংস্কার আর বিজ্ঞানমনস্কতার অভাব আমাদের তাড়া করে চলে।

'ও তুমি শেষে সন্তান দত্তক নিলে?' দত্তক মা-বাবাকে সমাজে খাটো করার জন্য অনেক কণ্ঠস্বর। দত্তক নিয়ে মা-বাবা হওয়া যেন এক ব্যর্থতা। তাদের 'নিম্নমানে'র মা-বাবা বলে দেগে দেওয়া হয়। প্রতিটি ভ্রুকুটি, প্রতিটি নাসিকা কুঞ্চন, প্রতিটি বাঁকা হাসি আমাদের আহত করে।'

প্রত্যুত্তরে আমরা বলি, 'না, এভাবেও মা-বাবা হওয়া যায়। এভাবে মা-বাবা হয়ে আমরা বেশ সুখে আছি। আমাদের খুশিতে হাত দিও না। আমাদের আমাদের মতো থাকতে দাও।।

* * * * *

'আত্মজা' আমাদের নিজেদের সংগঠন। *আত্মকথা* তার মুখপত্র। বহু বছর *আত্মকথা* খুব নিয়মিত প্রকাশিত হত। থাকত প্রবন্ধ, ছড়া, ছবি। *আত্মকথা*'র দশ বছর উপলক্ষে প্রকাশিত সংখ্যা তো বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

তবে, নানা কারণে *আত্মকথা*'র প্রকাশ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই আমরা ঠিক করলাম—আবার শুরু করব। করলাম-ও তাই।

এই বছর 'আত্মজা'র জন্মের পনেরো বছর। তাই এই সংখ্যায় আছে অনেক স্মৃতিচারণ, অনেক ছবি, ছড়া ও রান্নার হদিস।

আপনাদের কাছে পেশ করলাম *আত্মকথা*'র এবারের শারদ সংখ্যা। এতে আছে কিছু পুরনো লেখা, কিছু নতুনও।

পড়ে দেখবেন কিন্তু। আর জানাবেন কেমন লাগলো।

অলঙ্করণের জন্য শ্রী অভিষেক দাশ ও প্রুফ সংশোধনের জন্য ড: সুজিত কুমার মণ্ডলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

'আত্মজা'র দশ বছর : একটি চমৎকার যাত্রা

নীলাঞ্জনা গুপ্ত

['আত্মজা'র দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত *আত্মকথা*'র বিশেষ সংখ্যায় এই লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল ইংরেজিতে। লেখাটি আজও প্রাসঙ্গিক। তাই *আত্মকথা*'র এই সংখ্যায় প্রবন্ধটি বাংলায় পুনঃপ্রকাশিত হল।]

আমার দুই সন্তান : একজনের বয়স ১৬, অন্যজনের ১৫। প্রতিটি বাবা-মাই জানেন যে জন্মদিনে সকলেই সন্তানের দিকে অবাক হয়ে তাকায় এবং ভাবে এই শিশুই একদিন কত ছোটো ছিল। এখন সে সম্পূর্ণ নিজের ব্যক্তিত্ব, আবেগ এবং বুদ্ধিমত্তা নিয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে এবং আমাদের সকলের জীবনে কতখানি আনন্দ বয়ে নিয়ে এসেছে।

আমি যখন 'আত্মজা'র ফেলে আসা দশ বছরের দিকে তাকাই, আমার মধ্যেও ঠিক এই আবেগগুলিই কাজ করে। কত ক্ষুদ্র এবং সামান্য আরম্ভ থেকে শুরু করে 'আত্মজা' বিকশিত হয়েছে ও বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এখন আমরা আমাদের এই সংগঠনের দশ বছর পালন করছি।

সূচনা পর্ব

আমরা যখন ছোটো অনন্যাকে (যে বুচি নামেই বেশি পরিচিত) বাড়ি আনি আমাদের মনে কোনো সংগঠনের পরিকল্পনা ছিল না। আমাদের সমস্ত উৎসাহের কেন্দ্রই ছিল এই ছোট্ট শিশুটির সুস্থ সবল ও হাসিখুশি ভাবে বেড়ে ওঠা। কয়েকবছরের মধ্যেই দুটি ঘটনা ঘটে যার ফলে আমার মনে হয় এবার সত্যিই একটা সংগঠনের প্রয়োজন। ১৯৯৮ সালে সুইডেনের একজন পদার্থবিদ পিটার অ্যাপেল, গবেষণার কাজে কলকাতায় আসেন। তিনি নিজে একজন দত্তকগ্রহণকারী পিতা, পরে ইনি আমাদের সমগ্র পরিবারের ভালো বন্ধু হয়ে ওঠেন। তিনি এবং তার স্ত্রী কোস্তারিকা, শ্রীলঙ্কা ও ভারতবর্ষ থেকে একজন করে মোট তিনজন শিশুকে দত্তক নেন। তিনি ভারতের দত্তকপ্রথা ও তার কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আরও জানতে আগ্রহী ছিলেন। কোনও একজনের কাছ থেকে আমাদের ফোন নম্বর পেয়ে এক সন্ধ্যায় তিনি আমাদের বাড়ি আসেন। পিটার আমাদের সুইডেনের 'অ্যাডাপটিভ ফ্যামিলি অ্যাসোসিয়েশন' এবং তাদের কাজ সম্পর্কে বলেন। এই ভাবনাটা চমৎকার লেগেছিল। আমরা তাঁর কাছ থেকে ওই বিষয়ে অনেকটা জানতে পেরেছিলাম।

কাকতালীয়ভাবে, প্রায় একই সময়ে, আমরা এবং আরো কয়েকটি পরিবার—দত্তকগ্রহণকারী পিতামাতাদের পুনর্মিলন অনুষ্ঠানে 'মিশনারিজ অফ চ্যারিটি' দ্বারা আমন্ত্রিত হই। ওই অনুষ্ঠানেই, সিস্টার বার্নি এবং অন্য কয়েকজন সিস্টার কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবকের খোঁজ করেন, যাঁরা সপ্তাহে একবার অন্তত 'মিশনারিজ অফ চ্যারিটি'-তে আসতে পারবেন। এই স্বেচ্ছাসেবকের কাজ হবে কিছু আগ্রহী দত্তকগ্রহণকারী পিতামাতার সঙ্গে কথা বলা, দত্তকগ্রহণ বিষয়ে যাঁদের প্রচুর প্রশ্ন ও ভীতি। তারা একটি বাক্সর ব্যবস্থা করলেন যেখানে স্বেচ্ছাসেবক হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা তাদের নাম এবং যোগাযোগ নম্বর রেখে যেতে পারবেন। এর কিছু পরেই, তাদের তৈরি তালিকা অনুযায়ী ঠিক হয় যে প্রতি শনিবার বিকেলে কোন দু'জন দম্পতি শিশু ভবনে উপস্থিত থাকবেন। আমরা সকলে আগ্রহী পিতামাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। এই সাক্ষাৎকারগুলির ফলে আসলে স্বেচ্ছাসেবকের মধ্যেও একটা বন্ধুতা দৃঢ় হচ্ছিল। কিছু বন্ধুত্ব এখনও অটুট। এই বন্ধুত্বের হাত ধরেই তৈরি হয় একটি 'কোর গ্রুপ', যা অবশেষে তৈরি করে 'আত্মজা'। এই অনানুষ্ঠানিক কার্যক্রমের হাত ধরেই উঠে আসে অন্যান্য কার্যক্রম —

যেমন কাউন্সেলরদের সাথে কর্মশালা, প্রথম একটি প্রশ্নোত্তর পর্বে উপস্থিত ছিলেন জলি লাহা। নিয়মিতভাবে চলতে থাকে বার্ষিক পুনর্মিলন, মাসিক সাপোর্ট গ্রুপ মিটিং এবং অন্যান্য কার্যক্রম।

আমার মনে আছে সেদিন আমি বেশ মর্মাহতই হয়ে গিয়েছিলাম যখন কোনো এক সাপ্তাহিক জমায়েতে সিস্টাররা আমাদের সাথে বৈঠকে বলেছিলেন যে এখন এই দলের স্বতন্ত্র সংস্থা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবার সময় এসেছে। 'মিশনারিজ অফ চ্যারিটি'-র কাঠামোর বাইরে গিয়ে নিজেদের মতো করে কাজ করতে হবে। তখন শিশুভবনের ভারপ্রাপ্ত সিস্টার অড্রে ছিলেন এইরকমই একজন, 'মিশনারিজ অফ চ্যারিটি'-এর গণ্ডির বাইরে স্বতন্ত্রভাবে ছড়িয়ে পড়তে আমাদের উৎসাহিত করেন। আমরা সকলেই এর প্রতিবাদ করেছিলাম। আমাদের মনে হচ্ছিল আমরা বুঝি সিস্টারদের দ্বারা পরিত্যক্ত। এই ভাবনার কথা আমরা সিস্টারদের জানালাম। যাই হোক, তাঁরা এ ব্যাপারে এক প্রকার জোরই করলেন এবং 'ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ অ্যাডাপটিভ ফ্যামিলিজ' (NAAF) নামের একটি মুম্বাই ভিত্তিক সংস্থার এই বিষয়ের নানা প্রকাশনা দেখিয়ে প্রস্তাব দেন আমরা যেন একটা স্বতন্ত্র সংস্থা গড়ে তুলি।

অবশেষে ঠিক সেটাই হল। কয়েকবার আলোচনা এবং সাক্ষাৎকারের পর একটি সংবিধান প্রণীত হয়, উদ্দেশ্য চিহ্নিত হয়। ২০০০ সালের নভেম্বরে 'আত্মজা'-কে ওয়েস্ট বেঙ্গল সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী নিবন্ধীভূত করা হয়। আমার এখনও মনে আছে সেই সময় আমি দেশের বাইরে থাকায় আমাকে নিয়মিতভাবে ই-মেলে খবরাখবর জানানো হত। এইভাবে জন্ম নিল 'আত্মজা'—যদিও আমরা কী করব এবং কীভাবে করব তখন তার খুব সামান্য ধারণাই আমাদের ছিল।

প্রাথমিক বছরগুলি

'আত্মজা' বেশ অনন্য একটি প্রতিষ্ঠান। এটি কোনো অসরকারি সংস্থা (NGO) নয়, বরং একটি কমিউনিটিভিত্তিক সংস্থা (CBO) যেখানে কেবলমাত্র দত্তকগ্রহণকারী পরিবারেরা, যারা এই কমিউনিটির অন্তর্ভুক্ত, সদস্যপদ পেতে পারেন। 'আত্মজা'-য় বহুসংখ্যক বন্ধু পেয়ে আমরা গর্বিত। কিন্তু সদস্যপদ শুধুমাত্রই দত্তকগ্রহণকারী পরিবারদের জন্য। তাও, 'আত্মজা' সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাসেবকের ভিত্তিতে চালানো হয়। এখানে কোনো কর্মচারী নেই। একটি বিশেষ ও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছাড়া 'আত্মজা' কখনওই চাঁদা একত্রিত করে কার্যক্রমে নিয়োজিত হয়নি।

আমরা যখন এই সংস্থা শুরু করলাম, তখন আমরা 'আত্মজা'র স্থায়িত্ব নিয়ে সন্দিহান ছিলাম— 'আত্মজা'-কে কি বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে? এই সংস্থা কি সত্যিকারের কাজ কিছু করতে পারবে? অন্যান্য লোকেরা কি 'আত্মজা' সম্পর্কে উৎসাহিত হবে? আমরা এতই অনিশ্চিত ছিলাম যে পাঁচ বছরের সদস্যপদের জন্য একটি আর্থিক মূল্যদানের প্রস্তাব ঘোষণা করতে আমাদের পঞ্চম বার্ষিক সম্মেলন অবধি অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এইসময়ই আমরা আজীবন সদস্যপদ গ্রহণের কথা বলি। এর আগে আমরা একপ্রকার ভীত-ই ছিলাম, পরের পাঁচ বছর 'আত্মজা' অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবে কিনা সেই ভেবে। আজ এটা বলতে গেলে একটা গর্বিত অনুভূতি হয় যে আমরা শুধুমাত্র অস্তিত্বরক্ষাই করতে পেরেছি এমনটা নয়। বরং বিস্তার লাভ করে পশ্চিমবঙ্গ ছাপিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে দত্তকের ক্ষেত্রে আমরা একটি সম্মানিত নাম হয়ে উঠতে পেরেছি।

সম্পাদক স্বপন নস্কর, কোষাধ্যক্ষ গৌতম ঘোষ, প্রথম নির্বাহী কমিটির চেয়ারপার্সন হিসাবে আমি— এই কয়েকজন মিলে আমরা প্রথমে একটি ছোটো কর্মসূচি গ্রহণ করলাম। প্রতি দু'মাসে একটি কর্মসূচি নেব আমরা যত ক্ষুদ্র আর অনাড়ম্বর হোক না কেন। দত্তকগ্রহণকারী মায়েদের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থা করা ছিল আমাদের প্রথম কর্মসূচি, যা দিয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সুবীর মুখার্জী বহুদিন ধরে আন্দোলন চালাচ্ছিলেন বিষয়টিকে 'অধিকার' হিসাবে মান্যতা দেওয়ার জন্য।

একদম শুরুর সময় থেকে, আমাদের জনপ্রিয় কর্মসূচির মধ্যে একটি ছিল জানুয়ারির প্রথম বা দ্বিতীয় রবিবারে

নরেন্দ্রপুরে পিকনিক। আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা সত্যিই মজাদার ছিল। সেখানে কিছু নিয়ম নির্ধারিত হয়েছিল যা আজও অনুসৃত হয়। যেমন মধ্যাহ্নভোজনের পরে একটি সভা। অনুপ দেওয়ানজি - বর্তমান সম্পাদক, শিশুদের কর্মকাণ্ডের এবং খাদ্যতালিকা তৈরির ভারপ্রাপ্ত। সেখানেই প্রথমবার আমাদের সংস্থার ব্যানার তৈরি হয় এবং পরবর্তী ক'বছর সেটা স্থায়ীও হয়। আমাদের সংস্থার মতোই, তখন এই ব্যানার চমকপ্রদ হয়নি— সাদার উপর সাদামাটা নীল অক্ষর। শীঘ্রই আমাদের একটি লোগো (প্রতীক), লেটারহেড (প্যাড), ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং একটি কার্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি।

ওই বছরগুলোতে বহু মানুষ আমাদের সহায়তা করেছিলেন। পিনাকী দে, আমার একজন ছাত্র, একটি লোগো এবং লেটারহেডের নকশা করেছিল যা আমরা এখনও ব্যবহার করি। উপযুক্ত জায়গায় একটি অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন গৌতম গুপ্ত। শিয়ালদহের লোরেটোর সিস্টার সিরিল কোনো বিনিময় মূল্য ছাড়াই বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আমাদের কর্মশালার প্রথম পর্ব অনুষ্ঠিত করবার অনুমতি দেন। বহুবছর পরে ডঃ শক্রজিৎ দাশগুপ্ত 'আত্মজা'-কে প্রতি শুক্রবার গোলপার্কের কাছাকাছি 'বাউলমন' প্রকাশনীর অফিস ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছেন। ডঃ দাশগুপ্তর ('সতু বদ্যি' নামে যিনি বিশেষভাবে খ্যাত) সাথে বৈঠক এবং কথোপকথন আমাদের কাছে একটি দারুণ আনন্দের বিষয় ছিল। আমরা তাঁর কাছে বহু বিষয় জানতে পারি। মাসিমাও মাঝে মাঝে দেখা করতে আসতেন। তাঁর প্রাণবন্ত উপস্থিতি আমাদের কাছে এখনও স্মরণীয়। ডঃ দাশগুপ্তর প্রয়াণে 'আত্মজা' যে শুধু একটা অফিস ঘর হারালো তা নয়, বরং 'আত্মজা' হারালো তাঁর এক সত্যিকারের বন্ধুকে।

একদম শুরুর দিন থেকে, 'আত্মজা' এইসব ক্ষেত্রগুলোতে কাজ করবার চেষ্টা করছে—

- দত্তক গ্রাহক পরিবারের একটি সাপোর্ট গ্রুপ হিসাবে।
- যে সমস্ত পরিবার দত্তক গ্রহণের কথা ভাবছে, তাদের সাহায্য করা।
- দত্তক গ্রহণকারী পরিবার ও দত্তক শিশুদের আইনি অধিকার সম্পর্কে সুনিশ্চিত করা।
- আইনসম্মত দত্তক গ্রহণ প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করা।

গ্রুপ কার্যক্রমের সমর্থন

এটাই ছিল 'আত্মজা' তৈরির অন্যতম কেন্দ্রীয় সোপান। একটা সংগঠন হিসাবে আমরা আমাদের মতোই আর পাঁচজনের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারতাম। খোলাখুলিভাবে আমাদের আনন্দ ও ভীতির কথা আলোচনা করতে পারতাম। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল দত্তক শিশুরা তাদের মতো অন্য শিশুদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পেত এবং এটা উপলব্ধি করবার সুযোগ পেত যে তাদের মতো আরও অনেকে আছে এবং এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই, বরং এটা স্বাভাবিক। এইভাবে সামাজিক সাক্ষাৎকার ছাড়াও, আমরা কাউন্সেলর এবং মনোবিদদের সঙ্গে কাজ করতে শুরু করলাম। বহু মানুষ আমাদের সাথে মতামত বিনিময় করেছে।

আমাদের প্রথমদিকে খুব সহায়তা করেছেন 'সমীক্ষণী'র শ্রীমতি জলি লাহা। ডঃ কেদার ব্যানার্জী আমাদের সভ্য, এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর কাউন্সেলিং সার্ভিসেস এবং স্টাডিজ ইন সেলফ ডেভলপমেন্ট-এর কাউন্সেলররা সমস্ত রকম সাহায্যের জন্যই আমাদের পাশে ছিলেন। অধ্যাপক শেফালি মৈত্র, অধ্যাপক সৌমিত্র বসু, অধ্যাপক সাধন চক্রবর্তী, রিঙ্কু পাঠক এবং সুজাতা কার্যত আমাদের এই পরিবারের অংশ হয়ে গেছেন।

বছরে একবার আমরা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর কাউন্সেলিং সার্ভিসেস-এর সহযোগিতায় কর্মশালার আয়োজন করি। এই কর্মশালাটি 'আত্মজা'র সদস্যদের অভিভাবকত্ব সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর হয়। এতে 'আত্মজা'র বন্ধুরাও প্রায়ই অংশগ্রহণ করে থাকেন। আমরা আমাদের অভিভাবকদের ভূমিকা নিয়ে আরও সচেতন হচ্ছি। এবং এই প্রতিটি কর্মশালা প্রতিবারই আমাদের ভাবনার নিত্যনতুন খোরাক জোগায়, ভালো পিতামাতা হওয়ার জন্য আমাদের সহায়তা করে।

এর পাশাপাশি আমরা এমন অসংখ্য পিতামাতাকে সাহায্য করেছি যারা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের উপদেশ চেয়েছেন। কীভাবে শিশুদের তাদের অতীত জীবন সম্পর্কে জানানো যাবে থেকে শুরু করে তাদের জন্য সংবেদনশীল বিদ্যালয় কীভাবে নির্বাচন করতে হবে— এমনই সব বিষয়। 'আত্মজা'-এর সদস্যদের কাছে এই সাক্ষাৎকারগুলি একটা বড়ো শক্তির উৎস এবং এগুলিই আমাদের চিন্তাভাবনাকে অন্যদের সাথে ভাগ করে নিতে সাহায্য করে।

আমাদের অনুষ্ঠানগুলিকে আকর্ষণীয় করে তুলতে আমরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকি। যেমন ডঃ রায়ের বাড়িতে বার্ষিক রবীন্দ্র-নজরুল সংস্কৃতি সন্ধ্যা। ক্ষুদেদের দল ও তাদের বাবা-মা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছে— এই দৃশ্য যেমন আনন্দদায়ক, তেমনি এগুলি আমাদের গর্বিতও করে তোলে। এই অনুষ্ঠানের লক্ষণীয় ব্যাপার হল এখানে যত খুশি ফুচকা খাওয়ার ব্যবস্থা থাকে!

এছাড়াও আমরা সুরঞ্জন সাহার বাড়িতে বিদ্যালয়ের ছুটির দিনগুলিতে শিল্পকর্মের আসর বসাই। এখানে শিশুরা যখন কোনো কাজে যুক্ত থাকে, অভিভাবকেরা নিজেদের মধ্যে গল্প আলোচনায় মেতে ওঠেন। সকলের জন্য স্ন্যাক্সের ব্যবস্থা থাকে। এটা প্রায় একটা বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়ে গেছে। নন্দন-২-তে 'আত্মজা' সিনেমা প্রদর্শনের ব্যবস্থাও করে যেখানে 'মিশনারিজ অফ চ্যারিটি' পরিচালিত একটি হোম থেকে ২৫-৩০ জন শিশু আসার আমন্ত্রণ পায়। ওই দিনের জন্য তারা আমাদের সাথে মজায় মেতে ওঠে।

সদস্যদের দিক থেকে একটা দাবি ছিল যে সভাগুলি যেন সংক্ষিপ্ত পরিসরের না হয়, যাতে আমরা সকলে একসাথে অনেকখানি সময় ব্যয় করে মজার মাত্রাটা আরও খানিকটা বাড়িয়ে তুলতে পারি। তাই, বিগত পাঁচ বছর ধরে বেশ কিছু পরিবার কাছাকাছি ট্যুরিস্ট স্পটে বেড়াতে যাওয়ায় অংশগ্রহণ করছে। এইভাবে আমরা দিঘা, শালবনী, মুর্শিদাবাদ, শান্তিনিকেতন, বিষ্ণুপুর এবং চণ্ডীপুরে বেড়িয়ে এসেছি। সপ্তাহের শেষে লম্বা ছুটি পেয়ে অভিভাবক এবং শিশুরা সকলেই আড্ডা, গান এবং মজায় মেতে উঠেছিল। শিশুরাও প্রাণভরে খেলায় মেতেছিল। এগুলি আমাদের কাছে এক একটা অসাধারণ স্মৃতি হয়ে রয়ে গেছে— শালবনীতে দোল খেলার সময় দেবাশিষ রায় বয়স ভুলে তাঁর কন্যার মতো ছটফটে হওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে নাক থুবড়ে পড়ে যান। দিঘা যাওয়ার সময় ট্র্যাফিক জ্যাম আমাদের দলের মধ্যে লজিস্টিক সমস্যার সৃষ্টি করে— কিন্তু গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর পর এইসব সমস্যা মিটে গেল। মুর্শিদাবাদে চারপাশে ঘুরে দেখার পর হওয়া আড্ডাগুলো জম্পেশ হয়েছিল। প্রতিভাবান গায়ক-গায়িকা এবং পারফর্মার সঙ্গে থাকায় দলের কারোর একঘেয়ে লাগার বা চুপ থাকবার প্রশ্নই উঠত না।

এমনকি লোকজন আমাদের বার্ষিক সাধারণ সভায়ও উপস্থিত থাকার চেষ্টা করতেন কারণ সেটাও তাঁরা খুব উপভোগ করতেন। সভাতেও সংগঠন বিষয়ক কাজগুলি শেষ হওয়ার পর আমরা কতকগুলি আকর্ষণীয় শো-এর আয়োজন করতাম। এখানে শিশুরা এবং তাদের অভিভাবকরা অংশগ্রহণ করতেন। এছাড়া ম্যাজিক প্রদর্শনী বা অন্যধরনের বিনোদনের ব্যবস্থাও থাকত। আর এটা ছিল সমস্ত সদস্যদের সাথে একান্ত তথ্যাবলি ভাগ করে নেওয়ার উপযুক্ত সময়। আমাদের কার্যনির্বাহী সমিতির সভাগুলির সাথে প্রায়ই মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা থাকত এবং সেখানে প্রত্যেকে কোনো না কোনো সুস্বাদু পদের ব্যবস্থা করতেন, যার ফলে প্রায়ই সভার থেকে খাওয়াটাই বেশি ভালো হত। তাই, আপনি যদি খেতে ভালোবাসেন, তবে আমাদের কার্যনির্বাহী সমিতিতে নিজের নাম নথিভুক্ত করতে পারেন। 'আত্মজা'র সমস্ত শিশুরা জন্মদিনে কার্ড পায়। তারা যে আমাদের কাছে কতখানি দামি, এটা তাদের জানানোর জন্য এটা হল আমাদের একটা পদ্ধতি। আমাদের বার্ষিক কার্যকলাপগুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল শহরের মধ্যে বেড়ানো— সেটা হতে পারে চিড়িয়াখানা বা কলকাতা বিমানবন্দর, কিংবা কলকাতা বন্দর অথবা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে একটা বিকেল, আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য একত্র হওয়া।

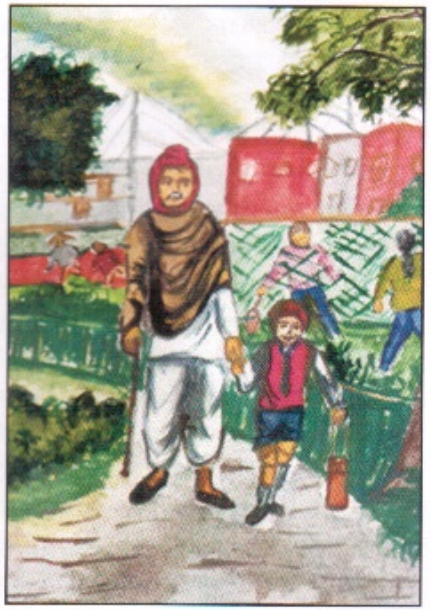

ছবি : সুচিস্মীতা শিকদার

ছবি : অমৃতা দেওয়ানজী

ছবি : সুচিস্মীতা শিকদার

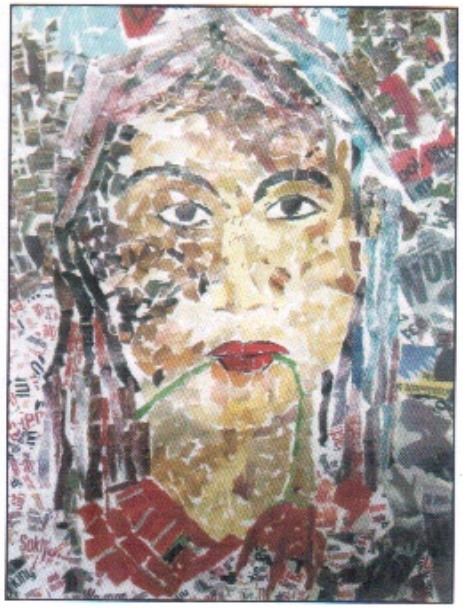

ছবি : অমিত দেওয়ানজী

আগ্রহী পিতা-মাতাদের সাহায্য করা

শুরুর দিনগুলো থেকেই 'আত্মজা' সেইসব পিতা-মাতাদের জন্য সমস্ত দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করে আসছে, যাঁরা দত্তক নেওয়ার জন্য গভীরভাবে চিন্তা করছেন। প্রাথমিকভাবে, সিস্টার অড্রে এবং 'মিশনারিজ অফ চ্যারিটি' দম্পতিদেরকে এই কর্মশালাগুলি দত্তক বিষয়ক সামাজিক, আইনগত ও আবেগগত বিষয়গুলি বুঝতে সাহায্য করতেন। 'মিশনারিজ অফ চ্যারিটি'র জন্য আমরা এরকম দশটা কর্মশালার আয়োজন করেছিলাম।

বর্তমানে, আমরা এইরকম কিছু কর্মশালার আয়োজন করছি সেইসব পিতা-মাতার জন্য যাঁরা 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর স্পনসরশিপ এবং অ্যাডপশন'-এ নিবন্ধভুক্ত। আমরা আশা রাখি অন্যান্য সংস্থাগুলিও দম্পতিদের এই সমস্ত কর্মশালায় যোগদান করবার জন্য উৎসাহিত করবে। এই কর্মশালাগুলি পিতামাতাদের দত্তক কেন্দ্রিক বিষয়গুলির সম্মুখীন হতে আরও সাহসী করে তোলে।

দত্তকগ্রহণ বিষয়ক তথ্য জানতে, সাহায্য, উপদেশ ও উৎসাহ পেতে কর্মশালা ছাড়াও, আমাদের কাছে প্রচুর ফোন আসে, ই-মেল আসে, অনেকে এসে দেখাও করে যান। এঁদের মধ্যে অনেকে আবার অন্য শহর যেমন পুনে, দিল্লির মতো দূর দূরান্ত থেকেও আসেন। এবং আমরা সহমর্মিতা ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে সাড়া দিই। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা দম্পতিরাও সময়ে সময়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন। এই সমস্ত পিতামাতারা যাতে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, তাঁর জন্য আমরা একটি ছোটো পুস্তিকা 'দ্য চাইল্ড মেন্ট ফর আস' এবং বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছি। এই কার্যকলাপগুলিই হল আমাদের কাজের মূল ক্ষেত্র। এবং আমরা সর্বদাই আনন্দিত হই যখন কোনো দম্পতি পিতামাতা হন।

আইনি সমস্যা

দত্তকগ্রহণকারী মায়েরা যাতে মাতৃত্বকালীন ছুটির অধিকার পায়, তার জন্য শুরুর দিন থেকেই 'আত্মজা' কাজ করে চলেছে। আমাদের সকলেই, যাঁরা দত্তক নিয়েছেন, বুঝতে পারবেন যে পিতামাতা ও শিশুর মধ্যে সফল বন্ধন তৈরি করতে প্রথম কয়েকটি সপ্তাহ কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, দত্তকগ্রহণকারী পরিবারের সাথে শিশুর একাত্ম হওয়ার জন্য এটা কতটা জরুরি। সুবীর মুখার্জী তাঁর সংস্থায় এই ছুটির জন্য লবি করতে নিরলস চেষ্টা করে গেছেন। বৃহত্তর ক্ষেত্রে এই বিষয়টিকে তুলে ধরতে তিনি আমাদের উৎসাহিত করেছেন। প্রথম কয়েক বছর, আমরা মায়েদের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি বিষয়ে, এবং যদি সম্ভব হয় তবে দত্তকগ্রহণকারী বাবাদের জন্যও ছুটি বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করার কাজ করেছিলাম। জৈবিকভাবে হওয়া বাবা-মা যেসব সুবিধা পায়, আমাদের দাবি ছিল প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে, দত্তকগ্রহণকারী পিতামাতার জন্যও সেই সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন লোকেদের সাথে দেখা করেছি। যেমন রাজ্যের মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপিকা যশোধরা বাগচি এবং তারপর মহিলা কমিশনের সমস্ত সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আইনমন্ত্রী শ্রী নিশীথ অধিকারী, বিধানসভার সদস্যগণ, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি এবং বিভিন্ন কর্মকর্তা, শ্রমিক সংঘের নেতা এবং এরকমই কেউ যিনি আমাদের সাহায্য করতে পারবেন। জনমাধ্যম, বিশেষত মুদ্রণ মাধ্যম, আমাদের সহযোগিতা করেছে। বহু সংবাদপত্রে আমাদের প্রচেষ্টার কথা মুদ্রিত হয়েছে। আমরা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি এবং প্রাসঙ্গিক কিছু কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের কাছে চিঠিও পাঠিয়েছি। সৌভাগ্যবশত আমরা কিছু জায়গা থেকে সাহায্যও পেয়েছি। রাজ্যসভার এম.পি. শ্রী নীলোৎপল বসুও আমাদের বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন। ২০০৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকার একটি অর্ডার চালু করেন, যা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ দত্তকগ্রহণকারী কর্মচারীদের মাতৃত্বকালীন ছুটির অধিকার দেয়। আমাদের কঠিন শ্রমের কিছু ফলাফল মেলায় আমরা উচ্ছ্বসিত হয়েছিলাম। এবং যখন দেখা গেল অর্ডারে এই বিষয়টিকে সরকারের দৃষ্টিতে নিয়ে আসার জন্য 'আত্মজা'র নাম উল্লিখিত রয়েছে, তখন সত্যিই আমরা আনন্দেই আরও বেশি রোমাঞ্চিত ও উচ্ছ্বসিত হলাম। এই বিষয়টিকে অনুসরণ করেই, বিভিন্ন রাজ্য এই নিয়ম প্রবর্তন করেছে। যদিও দুঃখের বিষয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার কখনও এটা করে উঠতে পারেনি। যাই হোক আমরা আশাবাদী যে বর্তমান পে-কমিশন আমাদের ধারাবাহিক দাবি/ প্রস্তাবকে গভীরভাবে বিবেচনা করবেন এবং শীঘ্রই একে জারি করবেন।

ইতিমধ্যে কিছু কিছু বেসরকারি কোম্পানি, স্বতন্ত্র সংস্থা এবং কর্পোরেশন তাদের কর্মচারীদের জন্য এই ছুটি মঞ্জুর করে। এই বিষয়ে জানার জন্য সারা ভারতের বিভিন্ন কোম্পানি যেমন প্রাইস ওয়াটার হাউস, ব্যাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্স আমাদের কাছে তাদের প্রশ্ন পেশ করেছে। প্রচলিত শাসনব্যবস্থায় এমন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনবার জন্য বিবিসি নিউজ আমাদের সংস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেছে যা প্রকৃতপক্ষে দত্তকগ্রহণের পক্ষে সদর্থক ইঙ্গিত।

২০০২ সালে এন জি ও প্রাজক দ্বারা 'আত্মজা' একটি সভায় আমন্ত্রিত হয়। 'প্রাজক' শিশুদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রতিষ্ঠানিক মান বিষয়ে আন্তর্জাতিক এন জি ও 'চাইল্ড রাইটস অ্যান্ড ইউ' (CRY)-এর অধীনে কাজ করে। আমি আর আমাদের সম্পাদক শ্রী স্বপন নস্কর কলকাতার আইন বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত সভাটিতে যাই। এখানে 'প্রাজক' আরও কতগুলি এন জি ও-কে আমন্ত্রণ করেছিল। আমরা শিশুদের অধিকার নিয়ে একটি গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণের চেষ্টা করি। 'চেষ্টা করি' শব্দটা এই কারণেই ব্যবহার করলাম কারণ, এই ধরনের প্রতিবেশ এবং আলাপ আলোচনায় আমরা তখন খানিকটা অনভ্যস্ত ছিলাম। এই পুরো প্রক্রিয়াটা যেভাবে চলছিল, আমরা তার সাথেও অভ্যস্ত ছিলাম না। আমার মনে আছে, আমরা দু'জনেই বিভ্রান্ত ও হতবুদ্ধি হয়ে এই সভা থেকে বেরিয়েছিলাম।

এরপর কয়েক বছর ধরে, শিশুদের অধিকার নিয়ে কর্মরত ১৮টি সংস্থার নেটওয়ার্কের কাজের সঙ্গে 'আত্মজা' ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। আমরা যৌথভাবে শিশুদের অধিকার রক্ষার কমিশন তৈরির দাবিতে একটা প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করি। এটি আমাদের আর একটি দাবি, যা অন্তত জাতীয় স্তর পর্যন্ত মান্যতা পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বিধনাসভার মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির কাছে আমরা অন্য একটি উপস্থাপনা পেশ করেছিলাম— শ্রী হাসিম আবদুল হালিম এটির তত্ত্বাবধান করেছিলেন— যেখানে আমাদের প্রশংসা করা হয়েছিল। দিল্লিতে CRY আয়োজিত একটি কর্মশালায় আমি 'আত্মজা'-র প্রতিনিধিত্ব করেছিলাম। সেখানে আমি ডঃ নীলিমা মেহেতার সাথে পরিচিত হই যিনি ভারতে দত্তক বিষয়ে কর্মরত সর্বজনবিদিত ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একজন এবং তখন তিনি CARA (সেন্ট্রাল অ্যাডাপশন রিসোর্স এজেন্সি)-এর একজন সদস্যা।

ওই সময়ে অন্য একটি বিষয় নিয়ে আমরা প্রচার চালাচ্ছিলাম, তা হল সমস্ত শিশুর জন্যই একইরকম জন্ম শংসাপত্র হতে হবে। এই চাহিদা খুব শীঘ্রই দেখা দিয়েছিল। আমরা সেই সমস্ত স্কুলের সাথে সাক্ষাৎ করেছি, চিঠি দিয়েছি যারা জন্মতারিখ জানতে নার্সিংহোমের শংসাপত্রর উপর জোর আরোপ করে। এইসব ক্ষেত্রে আমরা তাদের সহযোগিতা পেয়েছি। এই সময়ে আমরা একটি খসড়া বিল নিয়ে কাজ করছিলাম যাকে আমরা স্পেশাল অ্যাডাপশন অ্যাক্ট নাম দিয়েছিলাম, স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টের মতো। এটা একটা বিকল্প কিন্তু সমান্তরাল আইন হবে যাতে কিনা হিন্দু আডাপশন অ্যান্ড মেইন্টেনেন্স অ্যাক্টের কিছু ত্রুটি বাদ দেওয়া থাকবে। এই সময়ে 'আত্মজা'-এর সম্পাদক হন সীমন্তিকা নাগ। আমি ও সীমান্তিকা এই সময় আইনের পরিভাষায় কথা বলা শুরু করলাম কারণ আমাদের ভারতীয় ব্যক্তিগত আইন (Personal Laws in India) পড়া ছিল। সুপ্রিম কোর্টের বিচারমণ্ডলীর সাথে সাথে বুঝতে চেষ্টা করলাম বর্তমান পরিস্থিতি। অন্যান্য দেশের দত্তক সংক্রান্ত আইন ও নিয়ম মানতে শুরু করলাম এবং খসড়া লেখার চেষ্টা করলাম। আমরা বহু আইনজীবী, উকিল ও বিচারপতির সাথে সাক্ষাৎ করেছি, যেমন তাজ মহম্মদ, পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন মুকুলরঞ্জন এবং অ্যাডভোকেট বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রভৃতি। আমরা যখন এর মধ্যে নিমগ্ন ছিলাম তখন কেন্দ্রে জুভেইনাল অ্যাক্ট পাস হয়, অবশেষে রাজ্যেও হয়। আমরা খুবই আনন্দিত হই এটা দেখে যে আমাদের

চিন্তাভাবনার খানিকটা, যদিও সবটা নয়, এই নতুন আইন দ্বারা রক্ষিত হয়েছে।

নতুন আইন (জে জে অ্যাক্ট) কিছু বছরের জন্য বিলম্বিত হয় এবং একগুচ্ছ নতুন আইন সমেত ২০০৬-তে শেষমেষ এই আইন কার্যকরী হয়— অন্তত কাগজে-কলমে তো বটেই। আমরা তখনও সেই দশায় ছিলাম যেখানে আমরা শিশুকেন্দ্রিক ও প্রগতিশীল আইনের পূর্ণ প্রচলনের জন্য অভিযান চালাচ্ছিলাম। যদি এই আইন পুরোপুরি প্রচলিত হয় তবে তখন থেকে দত্তকগ্রহণ ব্যাপকতা লাভ করবে এবং বহু শিশু স্নেহময় ও যত্নশীল পিতামাতা পাবে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি বলতে পারি সংগঠনের এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে জড়ানো আমাকে এমন কিছু মানুষের সাথে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ করে দিয়েছে যাঁরা কাজের প্রতি উৎসর্গীকৃত, অক্লান্তভাবে যাঁরা শিশুদের অধিকারের জন্য লড়ে যাচ্ছেন। এঁরা ভারতের অন্যতম সম্মানিত ব্যক্তি। আমরা একটি সংগঠন হিসেবে ব্যাপক সংখ্যক মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হয়েছি— এঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রশাসক, আইনজীবী, রাজনীতিবিদ এবং সক্রিয় কর্মীরা, দত্তকগ্রহণকারী পিতামাতা ও দত্তক শিশুর আইনগত অধিকার নিশ্চিত করার তাগিদ থেকেই আমরা এটা করেছি।

এটা অবশ্য উল্লেখ্য যে আমাদের পুস্তিকা 'দ্য চাইল্ড মেন্ট ফর আস' (*The Child Meant for Us*)-এর দ্বিতীয় সংস্করণ এবং তার বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার পুরো খরচ জুগিয়েছে CRY।

আইনি দত্তকগ্রহণ প্রচার

'আত্মজা' ক্লান্তিহীনভাবে এটাই প্রমাণের চেষ্টা করছে যে দত্তকগ্রহণের একমাত্র উপায় হল আইনি দত্তকগ্রহণ। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশে ধনী ব্যক্তিরা প্রায়শই দত্তকগ্রহণের আইনি পথ এড়িয়ে বে-আইনি দত্তকগ্রহণ করে থাকেন। এই বিষয়েও সচেতনতার অভাব রয়েছে। 'আত্মজা' ধারাবাহিকভাবে এই বিষয় নিয়ে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। বিদেশি দত্তকগ্রহণের তুলনায় যাতে ভারতীয় দত্তকগ্রহণ বেশি অগ্রাধিকার পায়, আমরা তার উপর জোর দিচ্ছি। এই অবস্থার উন্নতির তাগিদে আমরা 'অ্যাসোসিয়েশন ফর আডাপ্টিভ পেরেন্টস' (Association for Adoptive Parents)-এর জাতীয় নেটওয়ার্কে অংশগ্রহণ করেছি। এই সংস্থাটি আবার মুম্বাইয়ের NAAF-এর গৌরাঙ্গ মেহতা পরিচালিত 'ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অফ অ্যাডপটিভ ফ্যামিলিস অ্যাসোসিয়েশন' (Indian Federation of Adoptive Families Association) বা IFAFA-এর ছত্রছায়ায় প্রতিপালিত। যদিও 'আত্মজা' এই সংস্থার কেবলমাত্র একটি সভায় অংশগ্রহণ করেছে, তবুও আমরা মেইল বা কখনো ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করছি। CARA ও IFAFA-এর গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা লক্ষ্য করা গেছে।

বহু গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে ও দূরদর্শনের অনুষ্ঠানে 'আত্মজা' দৃশ্যমান হয়েছে। এমনকি দত্তক বিষয়ে একটি পুরস্কারপ্রাপ্ত তথ্যচিত্র ছয় বছর কেটে যাবার পরে এখনও দূরদর্শন চ্যানেলে নিয়মিত সম্প্রচারিত হয়। এই তথ্যচিত্রের কেন্দ্রে রয়েছে 'আত্মজা'। এখানে যে শিশুগুলিকে দেখানো হয়, তারা সকলেই এখন বড়ো হয়ে গেছে।

লক্ষ্ণৌ ও সুইডেনের গবেষকরা ভারতে দত্তকগ্রহণ ব্যবস্থা নিয়ে তথ্যচিত্র নির্মাণের সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছে। বিভিন্ন সেমিনার এবং আলোচনা সভায় আমরা আমাদের চিন্তা-ভাবনাকে উপস্থাপন করতে পেরেছি। জাতীয় মহিলা কমিশন কর্তৃক আয়োজিত 'অ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাক্টিভ টেকনোলজি' (Assisted Reproductive Technology)-এর প্রস্তাবিত চুক্তি বিষয়ে সভাটি এর মধ্যে সাম্প্রতিকতম। এখানে 'আত্মজা'-এর উপস্থাপনা এবং মতামতগুলিকে যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

বর্তমানে, পশ্চিমবঙ্গে নতুন আইন প্রবর্তন করা হয়েছে এবং 'আত্মজা'-কে রাজ্যে সরকারি স্তরের দত্তক বিষয়ক কমিটি 'স্টেট অ্যাডপশন রিসোর্স এজেন্সি' (SARA)-এর স্থায়ী সদস্যপদ গ্রহণ করবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

বর্তমানে প্রযুক্তির যুগে একটা ওয়েবসাইটের প্রয়োজন আবশ্যক হয়ে পড়ে। আমাদেরই একজন সদস্য অর্পণ পাল আমাদের একটা ওয়েবসাইট তৈরি করে ও তাকে নিয়ন্ত্রণ করে একটা উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। ওর সার্ভের পরিসংখ্যান থেকে আমরা জানতে পারি প্রতি সপ্তাহে আমাদের ওয়েবসাইটে শতাধিক মানুষ প্রবেশ করে। যার ফলে আমাদের কার্যকলাপ একটা বিরাট জনসংখ্যার মধ্যে প্রচারিত হচ্ছে। এছাড়া একটা ভালো ওয়েবসাইট আমাদের বিষয়ে অন্যদেরও উৎসাহী করে তোলে। যেমন বলা যায়, পুনের একটি সংস্থা ক্যাটালিস্ট যার 'সোশ্যাল অ্যাকশন' আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছিল এবং বর্তমানে আমরা সাধারণ আগ্রহের কিছু বিষয় নিয়ে কাজ করছি। আমাদের মতে এটা আসলে ভারতবর্ষে দত্তকগ্রহণের হার বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে।

এখন 'আত্মজা' একটি নিউজ লেটার *আত্মকথা* শুরু করেছে যার মাধ্যমে আমরা আমাদের সদস্য এবং বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখতে পারব। আসলে এতক্ষণ ধরে আপনারা যেটা পড়ছেন সেটাও *আত্মকথা*-র একটা বিশেষ ইস্যু। যথারীতি এর সম্পাদনা করেছেন শ্রী স্বপন নস্কর। প্রতি বছর আমরা এরকম দু'টি ইস্যু প্রকাশের চেষ্টা করি।

আরও যা যা করতে হবে

আমাদের কাছে 'আত্মজা'-র কার্যক্রমের পরিসর গর্বিত হওয়ার মতো; ভারতে এরকম সংস্থাগুলির মধ্যে আমরা অন্যতম সক্রিয়। আমরা এটা করতে পারি তার কারণ আমাদের সদস্যরা এই দত্তক সংক্রান্ত বিষয়ের কাজে সমর্পিত প্রাণ এবং তারা স্বেচ্ছায় তাদের মূল্যবান সময় ও কর্মশক্তি দিয়ে যে কোনো মানুষকে সাহায্য করে চলেছে। 'আত্মজা'র কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের কাছে রাত-দিন বিভিন্ন রকম ফোন কল আসতে থাকে। তাঁরা অত্যন্ত ধৈর্য ও সহানুভূতির সাথে মানুষজনের সাথে কথা বলেন। নিজেদের সেরাটা দিয়ে মানুষকে সাহায্যের চেষ্টা করেন। এমনকি WBCS অফিসাররাও উপদেশের জন্য ফোন করেছেন, যা আমরা সাধ্যমতো পূরণ করার চেষ্টা করেছি।

যদিও, এই লেখায় কিছু ব্যক্তির নাম উল্লিখিত হয়েছে তাঁদের বিশেষভাবে নির্দিষ্ট অবদানের জন্য কিন্তু কিছু সদস্য এমন আছেন যাঁরা নীরবে নিজেদের সবটুকু দিয়ে কাজ করে চলেছেন। তাঁদের জন্য 'আত্মজা' গর্বিত। এরকমই একজন হলেন সঞ্জয় শিকদার, বর্তমানে 'আত্মজা'-র কোষাধ্যক্ষ। তিনি বরাবর 'আত্মজা'-র একজন নির্ভরযোগ্য সদস্য যিনি যেকোনো কিছুই অত্যন্ত নিপুণভাবে সম্পূর্ণ করেন। তিনি যখন কলকাতার বাইরে থাকেন, তখন সত্যিই আমরা তাঁকে নিদারুণ ভাবে মনে করি। আমাদের সমস্ত ইভেন্টে ছবি তোলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তিনিই পালন করেন এবং আমাদের সমস্ত কার্যক্রমের রেকর্ড রাখতে সাহায্য করেন।

'আত্মজা'-র শিশু গোষ্ঠীও বেশ উৎসাহব্যঞ্জক, কারণ এখানকার জ্যেষ্ঠ শিশুটি যখন পি এইচ ডি করছে তখন কনিষ্ঠটির বয়স এক বছরেরও কম। শঙ্কর, শতাব্দী, ডঃ সুবীর ব্যানার্জী এবং এঁদের মতো আরও নতুন সদস্যরা দায়িত্বগ্রহণ করেছেন। আরও অনেকে শনিবারে অনুষ্ঠিত কর্মশালার আয়োজন ও সঠিক পরিচালনায় সময় দিতে ইচ্ছুক।

আমাদের এই সমস্ত কাজ সত্ত্বেও কখনও কখনও এটা খুব করে মনে হয় যে কিছু সামাজিক নিয়ম দত্তক গ্রহণের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি, বহু দম্পতি আমাদের কাছে সাহায্যের জন্য এসেছেন। কিন্তু সদস্য হয়েছেন গুটিকয়েক দম্পতি। মানুষ এমনকি এটা গোপন করার চেষ্টা করেন যে তাঁদের সন্তান আসলে দত্তক নেওয়া। এই সামাজিক বেড়াজাল অতিক্রম করা এখনও খুব শক্ত। আমরা দেখেছি অনেক পিতামাতা আবার মনে করেন দত্তক গ্রহণের বিষয়টি শিশুদের কাছে গোপন রাখা ভালো। সেই কারণে সন্তানরা ছোটো থাকাকালীন সদস্য থাকলেও সন্তানের বয়স বাড়ার সাথে সাথেই তাঁরা 'আত্মজা'-র সাথে যোগাযোগ ছিন্ন করে দেন।

'আত্মজা' এইসব ব্যক্তিকে কখনোই দোষারোপ করে না। কিন্তু এটা পরিষ্কার যে পিতামাতা হওয়ার বিকল্প

(শেষাংশ... ১২ পৃষ্ঠায়)

অজানা পাখি

অস্মিতা শিকদার

ওই এল এক মিষ্টি পাখি
করছে শুধুই ডাকাডাকি
নামটি তার নাইবা জানি
ইচ্ছে করে ধরে রাখি!!

যায় সে উড়ে আকাশ পানে
তাকাই তখন উদাস মনে
আসবে সে যে আবার কবে
পরশু কিংবা কালই হবে!!

রান্নাবান্না

শ্রীমতি শেফালি শিকদার

ছানার ভাপা

উপকরণ

ছানা- ২৫০ গ্রাম, পোস্ত বাটা-২ চা চামচ, সর্ষে বাটা-২ চা চামচ, নুন- আন্দাজ মতো, হলুদ গুঁড়ো-১/২ চা চামচ, কাঁচা লঙ্কাবাটা-২ চা চামচ, চিনি -স্বাদ অনুসারে, সর্ষের তেল- ২ চা চামচ, তিল বাটা- ১ চা চামচ।

প্রণালী

ছানা ভালো করে জল ঝরিয়ে সব উপকরণ একসাথে মেখে রাখতে হবে। এবার একটা টিফিন কৌটোয় তেল মাখিয়ে মিশ্রণটা কৌটোয় ভরে নিন। প্রেশার কুকারটিতে অল্প জল দিয়ে টিফিন কৌটোটি প্রেশার কুকার-এ রেখে তিন/চারটে সিটি দিয়ে নামান। তারপরে টিফিন কৌটোটা খুলে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

ট্যাংরা মাছের পাতুরী

উপকরণ

ট্যাংরা মাছ- ৮ খানা, পেঁয়াজ কুচনো-৫০০গ্রাম, শুকনো লঙ্কাবাটা-২ চা চামচ, সর্ষের তেল- ৩ চা চামচ, কলাপাতা-বড় কয়েক টুকরো।

প্রণালী

মাছ ভালো করে ধুয়ে তার মধ্যে নুন, হলুদ, লঙ্কা বাটা, সর্ষের তেল দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে রাখুন। একটা বড় কলাপাতায় তেল মাখিয়ে মাছগুলো পাতার মধ্যে ভালোভাবে সাজিয়ে পেঁয়াজ কুচনোগুলো মাছের চারিধারে সাজিয়ে দিন। এবার বড় কড়াই কিংবা ফ্রাই প্যানে আর একটা বড় কলাপাতা দিন এবং তার উপরে মাছ সমেত আগের কলা পাতাটা দিয়ে উপরে ভালো করে চাপা দিয়ে মাঝামাঝি আঁচে বসিয়ে দিন। ১০-১৫ মিনিট পরে মাছের পাতাটা দেখতে হবে, দাগ ধরেছে কিনা। যদি দাগ ধরে তবে মাছ সমেত কলাপাতাটা উঠিয়ে একটা থালায় রাখুন। মাছের পাতার উপরে আর একটা কলাপাতা চাপা দিন। তার উপরে আর একটা থালা দিয়ে থালা-দুটো উল্টে দিন। এবার মাছ সমেত কলাপাতা আবার কড়াই কিংবা ফ্রাই প্যানে বসিয়ে দিন। ১০ মিনিট পরে আবার দেখতে হবে কলাপাতাটায় দাগ ধরেছে কিনা। দাগ ধরে গেলে বুঝতে হবে হয়ে গেছে। তখন গরম গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

পদ্ধতি হিসাবে দত্তক-গ্রহণ পদ্ধতি সমাজে এখনও পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি। অনেকের কাছে, এটা এমন একটি বিষয় যা গোপনীয়। স্পষ্টতই আমাদের সমাজের পরিস্থিতি এখনও দত্তক গ্রহণকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারেনি।

এদের কেউ প্রত্যক্ষভাবে দোষারোপ করতে পারবে না, কারণ— ভারতবর্ষে এখনও বংশ ঐতিহ্যকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। এখনও এখানে এই ধারণাই প্রচলিত যে অন্যান্য সমস্ত সম্পর্ক ও বন্ধন অপেক্ষা রক্তের সম্পর্কই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। জনপ্রিয় চলচ্চিত্রগুলিতে একটা সুখী মেলবন্ধন দেখানোর জন্য দেখানো হয় যে, শিশুদের শেষ পর্যন্ত তাঁদের জন্মদাতা পরিবারে কোনোভাবে ফিরতেই হয়। এই সমাজব্যবস্থায় যেখানে মাতৃত্বকেই নারীর মূল 'জীবিকা' বলে দেগে দেওয়া হয়েছে, সেখানে যে মা সন্তানকে জন্ম দেননি তাঁকে খানিকটা খামতিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট হিসাবেই দেখানো হয়।

এই ব্যাপারগুলি বলে দেয় কেন মানুষজন ব্যয়বহুলও ঝুঁকিপূর্ণ 'বেআইনি দত্তক' গ্রহণ পছন্দ করেন। কারণ তাঁদের মনে হয় এইভাবে তাঁরা দত্তক নেওয়ার বিষয়টি চেপে যেতে পারবেন। দম্পতিরা তাদের কাজ বা বাসস্থান পরিবর্তন করে এক বা দু'বছরের জন্য বাইরে চলে যান এবং ফেরেন একটি শিশু সমেত; ভান করেন যে ইতিমধ্যে তাঁরা একটি শিশুর জন্ম দিয়ে ফেলেছেন।

এই সমস্ত ছলচাতুরির ব্যাপারে 'আত্মজা'-র অবস্থান খুব স্পষ্ট। শিশুটিকে তার অতীত বিষয়ে সবকিছু খুলে বলা উচিত— এটা তার অধিকার, এবং এর ফলে পিতামাতারাও সন্তানের সাথে এমন একটা সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন যার দৃঢ় ভিত্তি হবে ভালোবাসা, বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা। তথাপি যেহেতু আমাদের দেশে দত্তকগ্রহণ সম্পর্কে এখনও নেতিবাচক ধারণা বর্তমান, তাই কিছু মানুষ এখনও মনে করেন এ বিষয়টা গোপন থাকাই ভালো।

এই সমস্ত সামাজিক পরিস্থিতির বিরুদ্ধে 'আত্মজা' সংগ্রামরত। এই পরিস্থিতির ফলে যে শুধুমাত্র বেআইনি নেটওয়ার্কগুলো তাদের জাল বিস্তার করছে, শুধু তা নয়, অসাধু ডাক্তাররাও দম্পতিদের জন্মদানকারী পিতা-মাতা হওয়ার বাসনাকে কাজে লাগিয়ে সুবিধা ভোগ করছে। তারাই দম্পতিদের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ফার্টিলিটি পরীক্ষা করিয়ে সারোগেট মা হবার ব্যবস্থা করিয়ে দেন।

দত্তক গ্রহণ একটা খুব সুন্দর প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে পিতামাতাদের সন্তান সম্পর্কিত মানসিক চাহিদা পূরণ হয় এবং এর ফলে একটি শিশুও একটি পরিবার, একটা ঘর এবং সঠিক যত্ন পায়। একটি শিশুকে দত্তক না নিলে তাকে বাকি জীবনটা রাস্তায় বা কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো ভাবে ধুঁকতে ধুঁকতে বাঁচার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়, এই পরিস্থিতিতে সামাজিক বঞ্চনা ও কর্মহীনতা তার পক্ষে অপরিহার্য। দত্তক গ্রহণকে উৎসাহিত করবার মধ্যে আসলে কোনো এককের স্বপ্নপূরণ করা হয় না, বরং একটা স্বপ্নের দেশের দিকে যাত্রা করা সম্ভব হয়। যে দেশে প্রতিটি শিশু নিরাপদ এবং নিজের ঘরে নিজের পরিবার নিয়ে সুখী।

'আত্মজা'-য় আমরা এটাই আশা করি যে, দত্তক গ্রহণের এই চমৎকার প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে আমাদের এই স্বপ্ন একদিন সত্যিই সার্থক হবে।

আকাশেতে কত তারা?

শুভা নস্কর

আহিতি (বুবলি) তখন বড়জোর তিন কি চার। প্রচণ্ড গরমে লোডশেডিং-এর সন্ধ্যা। ছাদে মাদুর পেতে শুয়ে শুয়ে বুবলি আর আমার তারা গোনার খেলা শুরু হল। 'ওরে বুবলি শোন্ তো, আকাশেতে কত তারা চুপ করে গোন তো'। এবার বুবলি গুনতে শুরু করল—এক, দুই, তিন, চার...। আর আমিও একপা একপা করে পৌঁছে গেলাম আমার ছোটবেলায়।

তখন আমি কত? বুবলির মতই-তিন কি চার। আমাদের এক জ্যাঠতুতো দাদা সোনারপুর বিদ্যাপিঠে অঙ্কের মাস্টার হয়ে যোগ দিলেন। আমাদের বাড়ি থেকে স্কুল পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ। দাদা তাই আমাদের বাড়িতে থেকেই স্কুলের চাকরি শুরু করলেন।

বাড়িতেই নিজেদের স্কুলের মাস্টারকে পেয়ে আমার দাদা-দিদিরা পরম উৎসাহে সন্ধ্যেবেলা অঙ্ক করতে বসেছে—হঠাৎ লোডশেডিং। মাদুর নিয়ে দুদ্দাড় করে আমরা সবাই ছাদে। আর তখনই শুরু হত ভূতোদার গল্প বলা। থুড়ি, ভূতোদা বলা যাবে না—স্বদেশদা। সোনারপুর বিদ্যাপিঠের অঙ্কের মাস্টারমশাই—স্বদেশরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। বাড়িতে ভুল করে ভূতোদা বলে ফেললেও স্কুলে যেন এ ভুল না হয় এ বিষয়ে দাদার ছিল কড়া হুকুম।

প্রতিদিনের গল্প বলা শেষ হলে ভূতোদা সুর করে বলত "ওরে শুভা, শোন্ তো, আকাশেতে কত তারা চুপ করে গোন্ তো।' আর আমিও তখন বুবলির মতো —এক, দুই, তিন, চার।

এই রকমই এক তারা গোনার খেলা খেলতে খেলতে এক সন্ধ্যায় বুবলি আমার পেটে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করল 'মা, আমি তোমার এই পেটুর মধ্যে ছিলাম?' আমি বললাম, 'না মা, তোমায় বলেছিলাম না, তোমাকে আমরা মাদার টেরিসার কাছ থেকে নিয়ে এসেছিলাম।'

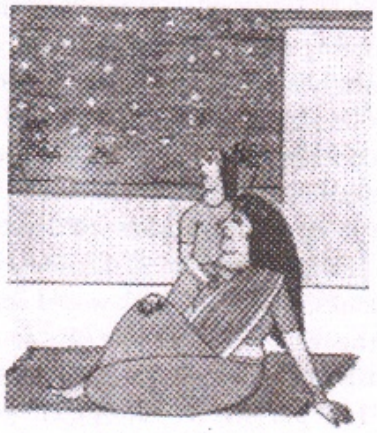

ছবি : আহিতি নস্কর

'না'—একটু জোর দিয়েই বলল বুবলি, 'আমি তোমার পেটুর মধ্যেই-ই ছিলাম। ঝলক আর ঝিলিক যেমন মামিমা আর মাসিমনির পেটুর মধ্যে ছিল।'

বুঝলাম খুব শিগ্‌গির দেখা দুই সদ্যোজাতর সঙ্গে নিজের পুরোপুরি মিল খুঁজে না পেয়ে ওর মনের মধ্যে এক বিপন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। তখনই আমার মনে পড়ে গেল আত্মজার কথা। বললাম, 'তুমি তো চেন কীর্তি, মিস্টু, অহনা, অনুষা, অনন্যা, ঋজু, ঋভুদের—ওরা সবাই তো মাদার টেরিসার কাছ থেকে এসেছে। ওরা তো সবাই আমাদেরই ছেলেমেয়ে। ছেলেমেয়ে পেটুর থেকেও হয় আবার এ ভাবেও হয়।'

শুনে, এক মুহূর্তে আমার মেয়ের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বুঝলাম 'আত্মজা'র সার্থকতা। আজ 'আত্মজা'র পনেরো বছরের জন্মলগ্নে এসে মনে হচ্ছে 'আত্মজা'র তারাগুলো আকাশে ফুটে থাক উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো।

Why opt for illegal Adoption ?

Sheemantika Nag

In India, adoption is an ancient custom, but even today people are sceptical about it. Adopting a child is not child's play. In our society we are extremely proud of family lineage and bloodline. Many feel that adopting a child of unknown lineage is demeaning and an admission of our failure to be a good parents. We want to adopt children from 'good' families, with good looks, which we think would ensure that the child would live up to our expectations. All these pressing demands have led parents to adopt illegally. Moreover, there are rules and regulations that specify the age and financial condition of the parents who may adopt legally. Above all, there is also a large number of children who are adopted illegally and trafficked.

CARA (Central Adoption Resource Authority) has now centralised the adoption process, which is on-line and transparent. This is no doubt a remarkable feat, but the question is - has CARA looked into the possibility of controlling illegal adoption that continues to go on in full swing? Does this practice, if not directly, at least indirectly lead to trafficking? Is there enough effort to control this phenomenon?

On 27th May 2015, I attended a live program on TARA TV's "Bhalo Achhi Bhalo Theko". We tried to create some awareness regarding the necessity of legal adoption. Several questions came over phone. They were mostly from people, who are unaware that the adoption process is not merely about bringing up the child but it also involves a legal process that entitles the adoptive child, his/her rights. A lot of parents are unable to adopt through the legal channel for various reasons. First, it is very cumbersome due to the inherent lengthy process, but more importantly, the rules and guidelines label the parents unfit to adopt, because of their age or income factor. There are also a large number of parents who want to keep the adoption a secret.

There are nursing homes and hospitals where unwanted children are born. A birth certificate is issued to the adoptive mother stating her name as the birth mother of the child. It is a win-win situation for the concerned parties. The only commitment here is money, which changes hands with no questions asked and the whole process

remains a secret. There are no norms to be followed, no bars attached. In the cities, there are touts who are on the look-out for moneyed people who do not mind shelling out a few lakhs to have a child delivered according to their choice, one who is fair, good-looking, etc.

Should we not be worried about this illegal adoption business? Should we not be concerned about the future of the illegally adopted child, where the parents could abandon a child any day, if they find him/her not living up to their expectations? Has the child been adopted/ bought with the intention of trafficking? We are yet to find an answer.

As we know, there has been a drastic reduction in the number of legal adoptions in West Bengal. Is it because the number of illegal adoptions has increased, and the number of legally "free for adoption" children has decreased or is it that, the people are less interested in adoption?

Many do not like to expose the secret of adoption. Disclosure has caused a big headache to a lot of parents. Though parents are advised to let the child know of their adoption before school going age, when they start interacting with outsiders, the majority of the parents tend to postpone the event. I have often pondered, why are most adoptive parents hesitant about disclosing the fact of adoption? Is it their inability to conceive a child; do they see it as their shortcoming; is it because bringing up a child of unknown parentage as their own is disapproved by the society? To keep the adoption under wraps, parents often go to the extent of changing jobs, locality or even leaving the city. But the question is - do they really manage to keep adoption a secret? These parents have no qualms in lying about the relationship; as a result, they live in constant fear of their secret being revealed. Often, we find these parents frantically contacting Atmaja regarding their children who have been informed of their adoption by acquaintances with no sympathy whatsoever for the child and the parents are at a loss as to how to deal with the situation.

If adoptive parents could get rid of the feeling that adoption is not something to be hidden, but an alternative way of becoming parents, this could at least reduce the number of illegal adoptions. CARA alongside the Government as well as other organisations can work together to create awareness against illegal adoption amongst common people. Doctors, Nurses, Hospitals, Nursing Homes, Police, etc., in my opinion, can all work together— there is no reason why we should not be able to reduce illegal adoption.

সন্তানের বিকাশ : আপনি কিভাবে সাহায্য করতে পারেন

সৌমিত্র বসু

সন্তানের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার জন্য যে সমস্ত বাবা-মা কাউন্সেলিং করাতে আসেন তাঁদের সাথে কথা বলতে গিয়ে আমরা লক্ষ্য করেছি যে সন্তানদের যে সমস্ত সমস্যা তাদের উদ্‌বিগ্ন করে তুলেছে সেই সমস্যার অনেকগুলিরই মূলে রয়েছে সন্তানদের প্রতি তাঁদের আচরণ। একথা অবশ্যই সত্য যে বাবা-মায়েরা সন্তানের ভালো চান, তারা যা কিছু করেন তা সন্তানের বিকাশে সাহায্য করবে ভেবেই করেন। কিন্তু অন্যান্য অনেক ভাবনার মতো সন্তানের ভালোর জন্য করা ভাবনাতেও যে কিছু ত্রুটি বা ফাঁক থেকে যেতে পারে তা বাবা-মায়েরা অনেক সময়ই খেয়াল করেন না। ফলত তাঁরা এমন কিছু কিছু আচরণ করেন যা না করলে সন্তানের পক্ষে ভালো এবং যা করা জরুরি তাই নিয়েই সংক্ষেপে আলোচনা করব।

সন্তানকে বড় করে তোলার সময় সন্তানের প্রতি যে ধরনের আচরণ বাবা-মা *না করলে* ভালো হয় সেরকম কয়েকটি আচরণ নিয়ে প্রথমে আলোচনা করা যাক।

তুলনা করবেন না

সাধারণত অন্য ছেলেমেয়েদের (তা নিজের হোক বা প্রতিবেশীর) সাথে তুলনা করে বাবা-মা সন্তানকে বোঝাতে চান যে অন্যরা যে কাজটা পারে সেও চেষ্টা করলেই সেটা পারবে বা তার পারা উচিত। বাবা-মা মনে করেন যে এভাবে তুলনা দিয়ে বোঝালে তাদের সন্তান অভিপ্রেত কাজ করার জন্য উৎসাহ পাবে। কিন্তু এতে যে সম্পূর্ণ বিপরীত ফল হতে পারে সে কথা তাঁরা খেয়াল করেন না। বাবা-মা সাধারণত ধরে নেন যে তার সন্তানের বয়সি অন্য কেউ যখন কাজটা করছে তখন তার সন্তানও নিশ্চয়ই সেটা পারবে। কিন্তু এমন হতেই পারে যে সন্তান হয়তো কোন কারণে ইচ্ছে থাকলেও কাজটা করে উঠতে পারছে না, বা হয়তো কোন কারণে তার এই কাজটার প্রতি বিশেষ অনীহা দেখা দিয়েছে। অন্যের সাথে তুলনা করলে এই দুটো ক্ষেত্রেই তার ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। 'অন্যে পারছে আমি পারছি না'—একথা ভেবে সন্তানের মনে হীনমন্যতা ও হতাশা সৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়া সে যদি মনে করে যে বাবা-মা তাকে বুঝতে পারছে না তা হলে রাগ বা বিরক্তি তৈরি হতে পারে। যেহেতু বাবা-মায়ের ওপর রাগ করে থাকা ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব তাই শেষ পর্যন্ত এই রাগ গিয়ে পড়তে পারে সেই কাজটির ওপর যা না করতে পারার ফলে সে 'তুলনার' শিকার হয়েছে। এই কারণে লেখাপড়ার বিষয়ে ছেলেমেয়েদের অন্যের সাথে তুলনা করলে লাভ তো হয়ই না, বরং লেখাপড়ার ব্যাপারে সন্তান আরও অমনোযোগী হয়ে পড়তে পারে। সুতরাং অন্যের সাথে তুলনা করলে সন্তানের ভালো হবে—এই ধারণাটা মন থেকে দূর করা এবং তুলনা করার অভ্যেসটা ত্যাগ করা দরকার।

সন্তানের আত্মমর্যাদায় আঘাত দেবেন না

বাবা-মায়েরা সন্তানকে শাসন করার সময় এমন কিছু কিছু কথা বলেন যা সন্তানের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে। পড়াশুনো বা বাবা-মায়ের চোখে 'দরকারি' অন্য কোন কাজ ঠিক মতো করতে না পারলে সন্তানকে শুনতে হয় 'তোর দ্বারা কিছু হবে না', 'তুই একটা বোকা','তোর লজ্জা করা উচিত', 'তোর মতো অকম্মা জীবনে দেখিনি' ইত্যাদি। বাবা-মা মনে করেন এই ধরনের কথা একরকম 'শক থেরাপির' কাজ করবে এবং এই সব কথা শুনে সন্তান তার সব কাজ এমনভাবে করার চেষ্টা করবে যাতে বাবা-মাকে ভুল প্রমাণ করা যায়। এই একই ধারণার বশবর্তী হয়ে বাবা-মা সন্তানকে অন্যের সামনেও অপমান

করে থাকেন। 'তোমার মেয়ের তো তুলনা হয় না; আমারটিকে দেখ, একেবারে বোকার হদ্দ...।' যে বাবা-মা এ ধরনের অপমানজনক কথাবার্তা ব্যবহার করে শাসন করেন তাঁরা যদি বুঝতে পারতেন এই সব কথা বার বার শুনলে তাঁদের সন্তানের কতখানি ক্ষতি হতে পারে তাহলে নিশ্চয়ই তাঁরা এগুলি বলতেন না। এই ধরনের কথা যে শুধুমাত্র সন্তানের আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দিতে পারে তাই নয়, সে মনে করতে পারে যে বাবা-মা তাকে আর তাঁদের ভালোবাসার যোগ্য বলে মনে করছেন না। বিশেষত বাড়িতে যদি একাধিক শিশু-কিশোর থাকে এবং একজনের প্রতি এ জাতীয় কথা প্রায়শই বলা হয় তাহলে তার আত্মবিশ্বাস অনেক বেশি ক্ষুণ্ণ হয়। সন্তানের মনে হতে পারে 'আমাকে কেউ ভালোবাসে না' এবং এরকম ভাবনা তার মনে গভীর অবসাদ তৈরি করতে পারে, সমস্ত কাজে তার উৎসাহ চলে যেতে পারে এবং বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার প্রবণতা দেখা দিতে পারে। সন্তানের বিকাশের জন্য তার আচরণের সমালোচনা করার প্রয়োজন হতেই পারে—কিন্তু সেই সমালোচনা হতে হবে গঠনমূলক, সমালোচনা করতে হবে একান্তে, সমালোচনার ভাষা এমন হতে হবে যাতে সন্তানের আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ না হয়।

ছেলেমেয়েদের আত্মমর্যাদায় সবচেয়ে বেশি আঘাত লাগে তাদের গায়ে হাত তুললে। বাবা-মায়েরা প্রায়শই বলে থাকেন 'কী করব বলুন, না মারলে কথাই শোনে না'। তাঁরা খেয়াল করেন না যে মারধর করে বা মারের ভয় দেখিয়ে যে কাজটা সন্তানকে করতে বাধ্য করা হয় সেই কাজের প্রতি সন্তানের কোন মমত্ববোধ গড়ে ওঠে না; বরং সুযোগ পেলেই সেই কাজটা না করার প্রবণতা বেড়ে যায়। অল্পবয়সের শিশুদের মারধর করা হলে তার শরীরে যত না আঘাত লাগে তার চেয়ে অনেক বেশি আঘাত লাগে তার মনে। এ ধরনের শাসনের দুটি বিপরীত মুখী প্রতিক্রিয়া হতে পারে : প্রথমত সন্তানের মনে ভীতিপ্রবণতা সৃষ্টি হতে পারে যা তার মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। অন্যদিকে বাবা-মায়ের কথাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা এবং বাবা-মায়ের প্রতি অশোভন আচরণ করার প্রবণতা তার স্বভাবে পরিণত হতে পারে। বড় বয়সের ছেলেমেয়েকে যদি মারধরের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে বেশি যেতে হয় তাহলে তার মনে বাবা-মা সম্পর্কে তীব্র অনাস্থা ও অশ্রদ্ধা দেখা দেয়। কারণ সে মনে করে বাবা-মা তাকে তার প্রাপ্য সম্মান দেন না। ফলে বাবা-মায়ের সাথে সন্তানের দূরত্ব তৈরি হয়। এই দূরত্ব কাম্য নয়। সন্তানের সাথে বাবা-মায়ের সম্পর্ক এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে সন্তান তার যে-কোন সমস্যায় বাবা-মায়ের পরামর্শ চাইতে পারে।

সন্তানের বিষয়ে নিজেদের মতবিরোধ সন্তানের সামনে প্রকাশ করবেন না

কী ভাবে সন্তানকে বড় করে তুললে সন্তানের ভালো হবে সে বিষয়ে স্বামী-স্ত্রীর মতপার্থক্য থাকতেই পারে। কিন্তু সন্তানকে তার করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ বা নির্দেশ দেওয়ার সময় যেন সেই মতপার্থক্য প্রকাশিত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। খেলতে যাবে কি না জিজ্ঞাসা করায় বাবা যখন মেয়েকে বলেন 'যাও, খেলে গে', তখন মা যদি বলেন 'একটু ড্রইং করতে বসলে পারতে'—তাহলে মেয়ের পক্ষে খুশি মনে দুটো কাজের কোনটাকেই বেছে নেওয়া সম্ভব হয় না। দিনের কতটা সময় পড়বে, কখন খেলতে যাবে, কতক্ষণ টি.ভি দেখবে, টি.ভি-তে কী কী দেখবে, বন্ধুদেরকে নিজের তৈরি করা লেখা দেখতে দেবে কিনা, বন্ধুদের বাড়িতে একা বেড়াতে যাবে কিনা—এরকম নানান ব্যাপারে ছেলেমেয়েকে পরামর্শ দিতে হয়। এসব ক্ষেত্রে বাবা-মায়ের মতপার্থক্য সন্তানের সামনে যত বেশি প্রকাশিত হবে করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সন্তানের পক্ষে ততই কঠিন হবে। বারবার এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে থাকলে পরবর্তী জীবনে সন্তান যে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রেই দোলাচল ও দ্বন্দ্বে ভুগতে পারে—অথবা বেপরোয়াভাবে সিদ্ধান্ত নিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে। সন্তানকেন্দ্রিক কোন বিষয়ে মত পার্থক্য থাকলে বাবা-মায়ের উচিত সন্তানের অনুপস্থিতিতে আলোচনা করে ঠিক করে নেওয়া সন্তানকে কী বলা হবে এবং কে বলবেন। অন্যজনও তখন উপস্থিত

থাকবেন এবং ওই বক্তব্যের বিরোধিতা করবেন না। এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া দরকার যে, শুধু সন্তান সম্পর্কেই নয় অন্য বিষয়েও নিজেদের ঝগড়া-বিবাদ সন্তানের সামনে যত কম করা যায় ততই ভালো। বাবা-মাকে ঝগড়া করতে দেখলে সন্তানের মনে নানা আশঙ্কার মেঘ জমা হয় যা তার দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্মকে ব্যাহত করে। বাবা-মায়ের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী অশান্তি শিশুকে অশান্ত করে তোলে এবং অনেক সময় শিশুর মধ্যে রোগলক্ষণও প্রকাশ পায়।

সন্তানের বিকাশে সহায়তা করার জন্য প্রাথমিক কাজ হল সন্তানকে বোঝার চেষ্টা করা। প্রতিটি বাবা-মাকেই মনে রাখতে হবে যে তাঁদের সন্তান তাঁদের থেকে 'স্বতন্ত্র' একজন 'ব্যক্তি'। সন্তানের স্বাতন্ত্র্যকে মুখে স্বীকার করলেই চলবে না, মনের গভীরে এই স্বাতন্ত্র্যের গুরুত্বকে মান্যতা দিতে হবে। সন্তানের স্বাতন্ত্র্যকে উপেক্ষা করলে তাকে ঠিকভাবে বুঝতে পারা সম্ভব নয়। আমি যা চাই আমার সন্তান কেন সে ধরনের আচরণ করে না তা যদি বুঝতে হয় তাহলে সন্তানের মনের জগৎটা আমাকে জানতে হবে। আমি যে দৃষ্টিতে জগৎটাকে দেখি আর আমার সন্তান (তার বয়স অনুসারে) যে দৃষ্টিতে দেখে, তার মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকাটাই যে স্বাভাবিক তা আমরা বড়রা অনেক সময়ই খেয়াল রাখি না। তিন বছর বয়সে স্কুলে ভর্তি করার পর বাবা-মা যখন দেখেন যে তাঁদের সন্তান স্কুলে শেখানো 'ছড়া' ('রাইম') কিছুতেই মুখস্থ করতে চাইছে না তখন তাঁরা ঘোর চিন্তায় পড়েন। বাচ্চাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন কেন ছড়াটা মুখস্থ করা জরুরি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁদের চেষ্টা বৃথা যায়। তিন বছরের শিশুর কথা তো ছেড়েই দিন, পাঁচ-ছয়বছরের ছেলেমেয়েরাও অনেক সময় পরীক্ষা কাছে এসে গেলেও পড়ার চেয়ে খেলাতেই বেশি ব্যস্ত থাকে। বাবা-মা কখনও শান্তভাবে, কখনও বকাবকি করে 'পরীক্ষার' গুরুত্ব এবং সময় অপচয় করার অবধারিত কুফল বোঝানোর চেষ্টা করেন। চেষ্টা ব্যর্থ হলে তাদের উদ্বেগ বাড়ে। এই উদ্বেগের হাত থেকে বাঁচা যায় যদি শিশুর মানসিক বিকাশের স্তরগুলি সম্পর্কে বাবা-মায়ের কিছুটা ধারণা থাকে। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন বিমূর্ত বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করার ক্ষমতা গড়ে উঠতে সময় লাগে। ১০-১২ বছর বয়সে পৌঁছনোর আগে শিশুরা বিমূর্ত বিষয়ের ধারণা পরিষ্কার বুঝতে পারে না। ফলে 'পরীক্ষা', 'সময়', 'গুরুত্ব' ইত্যাদি বলতে বাবা-মা কি বোঝাতে চাইছেন তা বুঝে ওঠা তার পক্ষে যথেষ্ট কঠিন কাজ। শিশুমন সম্পর্কে এই জাতীয় তথ্য জানা না থাকায় বাবা-মা বুঝতেই পারেন না কেন সন্তান তাদের কথা শুনছে না। তাঁরা ভাবেন সন্তান অবাধ্য হচ্ছে। এই একই কারণে সন্তান বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছলে তার সাথে বাবা-মায়ের ভুল বোঝাবুঝি আরও বাড়ে।

বয়ঃসন্ধির ছেলেমেয়েরা স্বাধীনভাবে ভাবতে পারে। বিকল্প সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা করার ক্ষমতা এই সময় বিকশিত হয়। ফলে বাবা-মা যে কাজটা যেভাবে করতে বলেন তারা সেটা সেভাবে না করে অন্যভাবে করার কথা ভাবতে পারে। এক্ষেত্রে বাবা-মায়ের অনেক সময়ই মনে হয় ছেলেমেয়ে তাঁদের কথা শুনছে না, মুখে মুখে তর্ক করছে ইত্যাদি। অর্থাৎ সন্তানের যে আচরণ প্রকৃতপক্ষে তার বিকাশের লক্ষণ সেটাকেই বাবা-মা তার 'অবাধ্যতা' বা 'সমস্যা' বলে চিহ্নিত করেন। সন্তান কেন আমার কথা শুনছে না তা বুঝতে হলে একদিকে যেমন সন্তানের স্বাভাবিক বিকাশের লক্ষণ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা দরকার তেমনি অন্যদিকে সন্তানের সাথে খোলামেলা কথা বলে তার ইচ্ছা-চাহিদা-চিন্তা-অনুভূতির জগৎটাকে বোঝার চেষ্টা করা দরকার। সন্তানকে তার কথা বলতে দিন, তার কথা মন দিয়ে গুরুত্ব সহকারে শুনুন। তার কোন আচরণ আপনার মনোমত না হলে তার সাথে কথা বলে বোঝার চেষ্টা করুন সে কেন ওই ধরনের আচরণ করল। তার আচরণে যদি আপনার উদ্বেগ হয়ে থাকে, তাকে সেটা জানান। কিন্তু আপনার মতামত, ইচ্ছা-চাহিদা যেন সন্তনের ওপর চেপে না বসে সে দিকে খেয়াল রাখুন। সন্তানের মধ্যে যে সমস্ত সম্ভাবনা ও দক্ষতা রয়েছে সেগুলি যাতে সে চিহ্নিত করতে পারে এবং বিকশিত করতে পারে সে ব্যাপারে তাকে সাহায্য করুন। 'আপনার মনের মতো' করে তাকে গড়ে তোলার চেষ্টা করবেন না।

আমি, তুমি ও আমরা...

সুজাতা রায় চৌধুরী

'ঋতুর পরে আসত ঋতু শুধু কেবল পঞ্জিকারই পাতে,
আমার আঙিনাতে
আনত না তার রঙিন পাতায় ফুলের নিমন্ত্রণ
অন্তরে মোর লুকিয়ে ছিল কী যে সে ক্রন্দন...
সংগোপনে বহন করে নিস্ফলতার পথে
দিনরাত্রি চলতেছিলেম আপন কর্মরথে'

নিজের একটি সন্তানের ইচ্ছা বোধকরি বেশিরভাগ মানুষেরই মনের মধ্যে সুপ্ত থাকে। তবু সন্তানকে বড় করতে গিয়ে আমরা অনেক সময়েই বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হই। কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রত্যেক মা-বাবাকেই প্রায় একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কিন্তু কিছু ভিন্ন পরিসর থাকে যেখানে সমস্যাগুলিও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন একটি শিশুর সাথে আমরা যে আচার-আচরণ করব, একটি কিশোর বা কিশোরীর সাথে আমরা তার বয়সোপযোগী আচরণ করব। এক্ষেত্রে প্রায় সকল মানুষের আচরণই দেশ-কাল ভেদে নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী হয়ে থাকে। কিন্তু ধরা যাক একটি শিশুর মধ্যে বিশেষ কিছু গুণের প্রকাশ দেখা যাচ্ছে— যেমন সে হয়তো তার বয়সের অন্য শিশুর তুলনায় অনেক বেশি বুদ্ধিমান বা খুব ভালো আঁকতে পারে, সেক্ষেত্রে কিন্তু তার সাথে তার বাবা-মা ছাড়াও সমাজে অন্যদের আচরণও কিছু আলাদা হবে। অর্থাৎ সংখ্যাতত্ত্বের হিসেবে যখন একজনের কোন অবস্থা ভিন্ন হয় তখন তার অভিজ্ঞতাও অন্যদের তুলনায় আলাদা হয়। এক্ষেত্রে এই শিশুটিকে বড় করার পথে তার মা-বাবাকেও কিছু ভিন্ন ধরনের আচরণের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়।

একই ভাবে যে শিশু তার জন্মদাতা বাবা-মার কাছে পালিত না হয়ে অন্যতর পরিবেশে লালিত হয় তাকে এবং তার পালয়িত্রী বাবা-মাকেও কিছু ভিন্ন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়। সেই অভিজ্ঞতাগুলি কি ধরনের হতে পারে এ বিষয়ে আগে থেকে কিছু ধারণা বা আভাস থাকলে সেগুলির মুখোমুখি হওয়া সহজতর হয়। এমন কিছু বিষয় নিয়েই এই লেখাটিতে আলোচনা করব।

Adoption শব্দটির সহজ বাংলা পরিভাষা হল পোষ্য পুত্র বা কন্যা গ্রহণ করা। কিন্তু আজ আমরা যখন কথা বলি তখন সেই কথার মধ্যে কিছু শব্দ বেশিরভাগ সময়েই বা সব সময়েই ইংরেজিতে বলি। যেমন সরি (sorry), থ্যাংক ইয়ু (thank you), রেডি (ready) হওয়া এবং আরো কত শব্দ। Adoption-ও সেই রকম একটি শব্দ। এই লেখাটিতে আমি adoption-এর বাংলা পরিভাষা 'পোষ্য গ্রহণ করা'র বদলে adoption-শব্দটি এবং adoption সম্পর্কিত কিছু ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করব।

যে কোন সন্তানকে বড় করা একদিকে যেমন আনন্দদায়ক ঘটনা, এর সাথেই কিন্তু ওতপ্রোতভাবে এটি পরিশ্রমসাধ্য এবং ধৈর্য ধারণ করার পরীক্ষা— সন্তানের জনক-জননী বা সন্তানের adoptive parents— এই দুজনের ক্ষেত্রেই এটা সত্য। তাই প্রতিটি পরিবারেই যেমন বাবা-মাকে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তেমনি adoptive parents-দেরও কিছু বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তবে এমন কিছু প্রশ্ন আছে যেগুলি শুধুমাত্র adoptive parents-দেরই মুখোমুখি হতে হয়। প্রথমত আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশীদের।

অনাবশ্যক কৌতূহলজনিত প্রশ্নের সমস্যা :

- তোমরা ওকে কোথা থেকে নিয়ে এলে?
- ওর আসল বাবা-মাকে জান? তারা কেমন?
- ওর মা কি করে প্রাণে ধরে নিজের বাচ্চাকে দিতে পারল?
- ও যখন বড় হয়ে জানবে তোমরা আসলে ওর বাবা-মা নও কি করবে?
- ও মা এ তো একদম তোমাদের নিজের বাচ্চার মতন!
- তোমরা adopt করেছ তো, এবার দেখবে ঠিক তোমাদের নিজেদেরই বাচ্চা হবে।
- আচ্ছা adopt করতে তোমাদের কত খরচ হল?
- বাচ্চাটার ভাগ্যটাই কিরকম বদলে দিলে তোমরা। ওকে না নিলে কি হত কে জানে।

এছাড়া আরো হাজারো এই ধরনের অশালীন প্রশ্ন এবং মন্তব্য হতে পারে adoptive parent-দের। তাই এগুলির মোকাবিলা কিভাবে করা হবে সেটা পরিষ্কার থাকলে সুবিধে হয়। এইধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হলে অনেক সময় পাল্টা প্রশ্ন করলে সমস্যাটি এড়ানো যেতে পারে। যেমন পাল্টা প্রশ্ন করা যায় - 'তুমি কেন জানতে চাইছ'? বা 'এটা জেনে তুমি কি করবে'? এছাড়া কিছু অন্য ধরনের উত্তর দেওয়া যায় যাতে মূল প্রশ্নটির গুরুত্ব এড়ানো যায়— 'আমি এটা নিয়ে মাথাই ঘামাইনি/ভাবিইনি'। বা - 'এটা নিয়ে আমি কখনো মাথা ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করিইনি', বা - 'দেখি, কি করা যায়।' কিংবা সাদামাটা ভাবে বলা যায় 'এখন আমার একটা কাজ আছে, পরে কথা বলব।' কিন্তু অবশ্যই এগুলি সর্বজনীন সমাধান নয়, এ ছাড়াও নিজেদের মতো করে এই অস্বস্তি কাটানো যায়।

এই জাতীয় সমস্যা ছাড়াও অনেক সময় বিশেষ কিছু সংশয় adoptive মা-বাবাদের চিন্তিত করে। তার মধ্যে একটি হল যে সন্তানকে কখন এবং কিভাবে adoption-এর কথা বলব? বা আদৌ বলব কিনা। বাস্তবে একটি বাচ্চার কাছে তার জন্ম এবং adoption সম্পর্কিত তথ্য গোপন রাখা উচিত নয়। তার বাবা-মা যে জন্মদাতা বাবা-মা নন, এই কথাটি তার adoptive বাবা-মার বদলে অন্য কারো কাছে প্রথমে শুনলে সেটা তার কাছে রূঢ় আঘাত হতে পারে। তার মা-বাবার ওপর বিশ্বাস এবং ভরসা কমে যেতে পারে। তার মনে হতে পারে যে তার বাবা-মা প্রকৃত সত্য তার কাছে গোপন করে তাকে প্রতারণা করেছে। সুতরাং adoption সম্পর্কে বাচ্চাটিকে খুব ছোটবেলাতেই, সে যাতে বুঝতে পারে এমনভাবে তাকে জানানো দরকার। একটি বাচ্চার বিভিন্ন বয়সে adoption সম্পর্কে তথ্য বিভিন্ন ভাবে জানাতে হয়।

অনেক সময়, মা হতে চলেছে এমন কোন মহিলাকে দেখে খুব ছোট (১ থেকে ৪ বছর বয়সি) একটি বাচ্চা স্বাভাবিক কৌতূহলবশত তার মা-বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে যে সেও কি তার মায়ের পেটে ছিল। এই বয়সের বাচ্চাদের যুক্তিবোধ অপরিণত থাকে, এবং সাধারণত তারা নিজেদের সম্বন্ধে যে কোন গল্প শুনতে খুব ভালোবাসে। তা ছাড়া এই বয়সে adoption-এর মানে তারা গভীরভাবে বুঝতে পারে না। তাকে adoption-এর ঘটনার সাথে পরিচিতি করানোর এটি উপযুক্ত সময়। কিন্তু এই ঘটনাটি যে ভাবেই বলা হোক না কেন তার মাধ্যমে কয়েকটি তথ্য তার কাছে পৌঁছনো প্রয়োজন। তাকে জানানো দরকার যে:

- সবাই যেমন করে জন্মায় সেও ঠিক তেমনি করেই জন্মেছে।
- সেও একটি মায়ের পেটে ছিল কিন্তু তার জন্মানোর সময়ে তার জন্মদাত্রী-মার কোন বাচ্চাকেই বড় করার মতো পরিস্থিতি ছিল না।
- সেই সময়েই তার বাবা-মার খুব ইচ্ছে হয়েছিল যে তাঁরা যেন বাবা-মা হতে পারে।
- সেই সময়ে তাঁরা ওকে adopt করেন এবং সে চিরকাল তাদের ছেলে/মেয়েই থাকবে।

তাকে adopt করার ঘটনাটির মতো তার জন্মানোর ঘটনাটিও যে তার adoptive বাবা-মার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত আনন্দজনক এই কথাটা বাচ্চাটিকে বারংবার বলা দরকার। সংসারে তার জন্মানো এবং

adoption এই দুটোর আনন্দ ও উত্তেজনা তার বাবা-মার মধ্যে থেকে তার মধ্যেও আবেশ ছড়াবে। ছোট বাচ্চাদের যে কোন জিনিসই বোঝাতে হলে বার বার বলতে হয় সে রূপকথাই হোক বা অন্য সত্য ঘটনাই হোক। তাই তার adoption-এর গল্পও তাকে বারংবার বলা দরকার তবেই সে এটিকে বুঝতে পারবে। গবেষণায় দেখা গেছে যে বাবা-মা'রা তাঁদের বাচ্চার বোঝার ক্ষমতা, আসলে যা তার চাইতে বেশি বলে ধরে নেন আর adoption সংক্রান্ত কথোপকথনের পুনরাবৃত্তি যতটা প্রয়োজন তার চাইতে কম করেন। প্রকৃতপক্ষে adoption সংক্রান্ত কথোপকথন সারা জীবন ধরেই চলতে থাকে। বারবার সে জিজ্ঞাসা করতে থাকে—

'এলেম আমি কোথা থেকে,
কোনখানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে।'

এবং সেটি যেভাবেই বলা হোক না কেন, বাচ্চাটির কাছে যে বার্তাটি পৌঁছনো দরকার সেটি হল—

মা শুনে কয় হেসে কেঁদে
খোকারে তার বুকে বেঁধে—
ইচ্ছা, হয় ছিলি মনের মাঝারে
...
আমার চিরকালের আশায়,
আমার সকল ভালোবাসায়,...
কতকাল যে লুকিয়ে ছিলি কে জানে।

—এই অভীপ্সার ভাবটি।

আর একটি বিষয়ে কিছু সতর্কতা প্রয়োজন। পরিবার সম্পর্কে যে কোন প্রশ্নের ক্ষেত্রে বিশেষ শব্দ ব্যবহার করাটা জরুরি। তার জন্মদাত্রী মাকে বোঝানোর জন্য 'যে মা তোমায় জন্ম দিয়েছিলেন' এই ভাবে বললে, তার পক্ষে জন্মানো এবং adoption-এর মধ্যে তফাৎ করা সহজ হবে। সে জানবে যে সকলের জন্ম একভাবে হয় কিন্তু একটি বাচ্চার প্রতিপালন অন্য জায়গাতেও হতে পারে। এবং সেই কারণেই 'আসল মা', 'আসল বাবা', এই শব্দগুলির ব্যবহার পরিহার করা দরকার। 'আসল মা-বাবা' বললে বাচ্চাটির মনে adoptive মা-বাবার সঙ্গে তার সম্পর্কের জায়গাটি যেন নকল বা অস্থায়ী এমন ধারণা হতে পারে। বরং adoptive মা-বাবার ক্ষেত্রে তাকে 'মা', 'মাম্মি', 'বাবা', 'বাপী' এরকম ভাবে ডাকতে শেখালে, পরিবার বলতে কি বোঝায় সেই ধারণাটি তার কাছে সহজে পৌঁছবে।

যেহেতু আরো একটু বড় (৬-৮ বছর) বয়সি বাচ্চারা অধিকতর পরিণত, তাই তাদের প্রশ্নগুলিও বেশিরভাগ সময়ে স্পষ্ট এবং আরো জটিল। এই বয়সে তারা জন্মানো এবং adoption— এ দুটির তফাৎ করতে পারে এবং তার জন্ম সম্পর্কিত তথ্য বিস্তারিত ভাবে জানতে চায়। তার জন্মদাত্রী মা কি কি করতে পারত বা কি কি করেনি সেগুলি সম্পর্কে তারা জানতে চায়। সব প্রশ্নই 'কেন' দিয়ে শেষ হয়। ঠিক কি কারণে তিনি তাকে পালন করেননি সেটি জানতে চায়।

- সেই মা কি খুব গরিব ছিল? তাহলে বেশি করে কেন চাকরি করেনি?
- সেই মা কি জানত না কি করে বাচ্চাদের বড় করতে হয়? তাহলে শেখেনি কেন?

এর একটা কারণ এই যে এই সময়ে তাকে পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব বা কোন কোন ক্ষেত্রে আত্মীয়-পরিজনের কাছেও নানারকম অরুচিকর প্রশ্ন ও ব্যঙ্গের মুখোমুখি হতে হয় এবং সেগুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে। ঠিক যেমন adoptive মা-বাবাকে বিভিন্ন ধরনের কৌতূহলের সম্মুখীন হতে হয় তেমনি adopted বাচ্চাদেরও প্রায় একই ধরনের প্রশ্ন শুনতে হয়:

- তোর আসল মা কে? এ কী রে! তোর আসল বাবার নাম জানিস না?
- কি রে তোর আসল মা নাকি তোকে চায় না বলে দান করে দিয়েছে?
- তোকে নাকি ডাস্টবিনে কুড়িয়ে পেয়েছে?
- তুই কি অনাথাশ্রমে ছিলি?
- তোর জানতে ইচ্ছে করে না তোর আসল মা-বাবা কেমন?

এই ধরনের অশালীন প্রশ্নের সামনে যাতে একটি adopted বাচ্চা অসহায় হয়ে না পড়ে সে জন্যই তাদের adoption সম্পর্কে তাদের যত স্বচ্ছ ধারণা থাকবে তত তারা নিরাপত্তাহীনতা থেকে মুক্ত থাকবে। তাই এই সময় থেকে তারা নিজেদের অতীত জীবন সম্পর্কে জানতে চায়। তার মা-বাবার কাছে 'কেন' প্রশ্নগুলো করে সে তার জন্মদাত্রী মায়ের পরিস্থিতি ও নিজের অতীত ভালো করে বুঝতে চায়। এই জটিল ঘটনার অনির্দিষ্ট উত্তর তার কাছে পীড়াদায়ক হতে পারে। তার মনের মধ্যে বারংবার আলোড়িত হয়।

যেখান থেকে এসেছিলেম
সেথায় যেতে চাই।
কিন্তু সে যে কোন জায়গা
ভাবি অনেকবার।
মনে আমার পড়ে না তো
একটুখানি তার।

যে পরিবারে সে জন্মেছে সেই অজানা মা-বাবা-ভাই-বোনের জন্য তার ব্যাকুলতা থাকতে পারে। ঠিক যেমন যে কোন মা-বাবা যদি জানতে পারেন তাদের কোনও মেয়ে বা ছেলে কোথাও আছে, তার জন্য তারা যে ব্যাকুলতা অনুভব করবেন তেমনি একটি adoptive বাচ্চার মনেও তার অজ্ঞাত পরিবারের জন্য দুঃখ হতে পারে। এইরকম পরিস্থিতিতে adopted মা-বাবা তাদের সন্তানের এই জটিল অনুভূতিগুলিকে স্বীকার করে তাকে বোঝাতে পারেন যে এরকম মনে হতেই পারে। তার কাছে adoption-এর ঘটনাটি যেমন খুশির তেমনি তার ফলে এরকম দুঃখ হওয়াও স্বাভাবিক। এই অনুভূতিগুলিকে এক এক জন এক এক রকম ভাবে প্রকাশ করে। কোন বাচ্চা হয়তো কৌতূহলী হয়ে এ বিষয়ে খোলা মনে আরো আলোচনা করে, কেউ হয়তো পুরোটাই অস্বীকার করে, কোন বাচ্চা নিরাপত্তাহীনতা ও উদ্‌বেগ সামলাতে না পেরে রেগে যায়, অবাধ্যতা ও অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। এই সময়ে তাদের সাথে কথোপকথন চালিয়ে যাওয়াটা খুব জরুরি। তার সাথে কথা বললে তবে তাঁরা বুঝতে পারবেন বাচ্চাটি কি ভাবছে, কোথাও কোন বিষয়ে তার ভুল ধারণা হচ্ছে কিনা এবং একই সাথে তাঁরা সে যা ভাবছে তার কিছু বিকল্প তার সামনে এনে দিতে পারেন। জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা যেমন আমাদের অনেক ধারণা পরিবর্তন করে তেমনি একটি বাচ্চার ক্ষেত্রেও তার মানসিক, শারীরিক ও বৌদ্ধিক পরিবর্তনের সাথে সাথে adoption সম্পর্কে ধারণারও পরিবর্তন ঘটে।

বয়ঃসন্ধিকাল যেকোন কিশোর-কিশোরীর ক্ষেত্রে নানাদিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে যেকোন ছেলে বা মেয়ে দেহে, মনে, বুদ্ধিতে সর্বত্রই বিপুল পরিবর্তন অনুভব করে, তাই এটি তার জীবনের একটি উত্তাল ও অশান্ত সময়। বয়ঃসন্ধিকালের এই বিপুল পরিবর্তনগুলি কি ও সেগুলি সম্পর্কে সঠিক তথ্য, বাবা-মা ও কিশোর-কিশোরী— এই দুপক্ষেরই বিস্তারিতভাবে জানা দরকার। মা-বাবার সাথে তাঁদের সন্তানের সম্পর্ক ভবিষ্যতে কেমন হবে তার অনেকখানি নির্ভর করে এই সময়টি বাবা-মা ও সন্তান কিভাবে মোকাবিলা করছেন তার উপর। যেহেতু জীবনের এই পর্যায়ে একজন কিশোর বা কিশোরী সমাজে, সংসারে, পরিবারে তার নিজস্ব স্থান করে নিতে চায়, তার আত্মপরিচয় তৈরি করে, তাই বিশেষ করে এই সময়ে একজন adopted ছেলে বা মেয়ে তার জীবনের শিকড়ের সন্ধানে আকুল হয়ে ওঠে। ছোটবেলা থেকে যে সমস্ত প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে এই সময়ে যেন সেগুলো তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয়। তাই যতটা সঠিক তথ্য adoption সম্পর্কে তার বাবা-মার কাছে আছে, সবটাই তাকে সহমর্মীতার সাথে জানানো দরকার। না হলে তার মনে হীনমন্যতাবোধ, নিরাপত্তাহীনতা, রাগ, দুঃখ, জীবনের প্রতি হতাশা এগুলি বাসা বাঁধতে পারে। এই

পর্যায়ে কখনো কখনো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কাউন্সেলরের সাহায্যও নেওয়া যেতে পারে। যদিও বয়ঃসন্ধিকালে অনেক সময়ে ছেলেমেয়েরা মা-বাবার সাথে বেশি কথা বলতে অনাগ্রহী থাকে তবুও বাবা-মার দিক থেকে তাদের সাথে কথোপকথন করাটা খুব প্রয়োজন। তাঁরা যদি মনে করেন সেখানে তাঁদের অনেকটা অসুবিধে হচ্ছে তাহলে তাঁরাও প্রয়োজনে কাউন্সেলরের কাছে যেতে পারেন। এই সময়টিতে adoption সম্পর্কে তার নিজের সাথে বোঝাপড়া সফল হবে যদি বয়ঃসন্ধির উত্তরকালে তার adoptive বাবা-মাকে মনে হয়—

আমার মা না হয়ে তুমি
আর-কারো মা হলে
ভাবছ তোমায় চিনতেম না,
যেতেম না ওই কোলে?

এবং নিজের adoptive অবস্থানটি তার কাছে হয়ে উঠে—

যেমন আছি
তোমার কাছেই
তেমনি থাকি!
দেখব আমায় কে কী করে।
চিরকালই
রইব খালি
তোমার ঘরে।

"সন্তানের বিকাশ : আপনি কিভাবে সাহায্য করতে পারেন" ও "আমি, তুমি ও আমরা"... লেখা দু'টি পড়ে যদি পাঠকের মনে সন্তানকে বড় করা নিয়ে আর কোনও প্রশ্ন থাকে— লিখে পাঠান এই ঠিকানায়:
আত্মকথা, ৫১৭ যোধপুর পার্ক, তিনতলা, কলকাতা-৭০০০৬৮। লেখকেরা পরের সংখ্যায় তার উত্তর দেবেন।

কেন 'আত্মজা'য়?

শতাব্দী দাশ (চট্টোপাধ্যায়)

দেখতে দেখতে তেরো বছর কেটে গেল। সেই ২০০২ সালের ৪ঠা নভেম্বর দীপাবলির দিন আমাদের ঘরে জ্বলে উঠেছিল খুশির প্রদীপ। ওই দিন বাড়ি এসেছিল আমাদের পুত্র ঋতায়ন। প্রাথমিক খুশি-আনন্দের জোয়ারে ভেসে যাবার পর, দু'এক মাস পর থেকেই মনে হতে লাগল, আচ্ছা ছেলে যখন বড় হবে, তখন কি তাকে সত্যিটা জানাব? নাকি গোপন করে যাব সব কিছু? এই রকম দো-টানায় পড়ে মনে হত যে আমাদের মতো আরও যাঁরা দত্তক সন্তানের বাবা-মা আছেন, যদি যোগাযোগ হত তাদের সঙ্গে! যদি জানতে পারতাম কীভাবে তাঁরা বড় করছেন সন্তানকে, তাহলে কী ভালই না হত। ছেলেও বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক বন্ধু-দাদা-দিদি-ভাই-বোন পেত, যারা তারই মতো দত্তক সন্তান, মনে হত, সত্যিটা জানার পর, বিশেষত বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছে, যদি ও নিজেকে একা মনে করে? যদি মানিয়ে নিতে না পারে সবকিছুর সঙ্গে? আচ্ছা, এরকম কি কোন সংগঠন নেই, যেখানে আমরা খুঁজে পাব আমাদের মতো মা-বাবা আর আমাদের ছেলের মতো সন্তানদের? এইসব প্রশ্ন যখন মনে তোলপাড় করছে, সেই সময় আমরা যে 'হোম' থেকে ছেলেকে পেয়েছিলাম, তাঁরা একটি ওয়ার্কশপে যাবার কথা বললেন, যেখানে সন্তান দত্তক নেওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা হবে। ততদিনে কেটে গেছে প্রায় দু'বছর। উল্টোডাঙার IBRAD-এর প্রেক্ষাগৃহে সেই কর্মশালায় আমরা দুজনে উপস্থিত হলাম ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। সেখানে বিভিন্ন বক্তার মুখে সন্তান দত্তক নেওয়া এবং তার পরবর্তী বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা শুনলাম। কয়েকজন অভিভাবকও তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা বললেন। সেদিনই কারও মুখে শুনলাম 'আত্মজা'র কথা। 'আত্মজা' পশ্চিমবঙ্গের দত্তক সন্তানদের বাবা-মায়েদের একান্ত নিজস্ব একটি সংগঠন। পেলাম ওনাদের ফোন নাম্বার। ওই নাম্বারে ফোন করতে ওনারা জানালেন প্রতি সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে ওনারা কয়েকজন নিয়ম করে গোলপার্কের 'বাউলমন'-এর অফিসে উপস্থিত থাকেন সংগঠনের কাজকর্ম নিয়ে আলোচনার জন্য। সেখানে গিয়ে ওনাদের সঙ্গে দেখা করা যাবে। পরের সপ্তাহের ওই নির্দিষ্ট দিনে আমরা গেলাম সেখানে। আলাপ হল সংগঠনের কার্যকরী সমিতির সঙ্গে—নীলাঞ্জনাদি, শর্মিষ্ঠাদি, সীমন্তিকাদি আর অনুপদার সঙ্গে। আলাপের সঙ্গে সঙ্গেই ওঁরা আপন করে নিলেন আমাদের। তাঁদের সঙ্গে সেদিন যে একাত্মতা অনুভব করেছিলাম আমরা, দিনে দিনে তা শুধু বেড়েই চলেনি, 'আত্মজা'-র অন্য সকলের সঙ্গেও গড়ে উঠেছে এক নিবিড় আত্মীয়তা। 'আত্মজা'র সদস্য হলাম আমরা। আমাদের ছেলে পেল ওরই মতো অনেককে—কেউ হল দাদা-দিদি, আবার কেউ বা বন্ধু। আমরাও পেলাম অনেক বাবা-মাকে, যাঁরা হয়ে উঠলেন আমাদের বন্ধু।

'আত্মজা' থেকে প্রতিবছর হয় পিকনিক, বাৎসরিক ভ্রমণ, বিজয়া সম্মিলনী, রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী, প্রভৃতি অনুষ্ঠান। ছেলে-মেয়েরা, তার সঙ্গে বাবা-মায়েরাও অপেক্ষা করে থাকি, কবে আসবে ওই দিনগুলি। দেখা হবে সবার সঙ্গে। কোন সদস্যের কোনো সমস্যা হলে, বিশেষত সন্তানকে নিয়ে, অন্য সদস্যরা চেষ্টা করেন তার সুরাহা করতে। প্রয়োজনে সাহায্য করা হয় পরস্পরকে। 'আত্মজা'র সদস্য হবার পরেই জানলাম কীভাবে সন্তানকে জানাতে হবে যে সে আসলে দত্তক সন্তান, এবং এই কাজটা সন্তান যত ছোট থাকতে করে ফেলা যায়, ততই তা সন্তানের কাছে সহজগ্রাহ্য হবে। বয়ঃসন্ধিতে যাতে বাইরের কোন মানুষের থেকে সত্যিটা জানার পর তার কোনো মানসিক সমস্যা তৈরি না হয়, তাই বাবা-মার উচিৎ আগে থেকেই

তাকে সব জানানো।

'আত্মজা'র বাৎসরিক ভ্রমণও ভীষণ আনন্দদায়ক হয়। সকলে মিলে আনন্দ করে, বেড়িয়ে, গল্পে, গানে, বাচ্চাদের খেলাধূলায় কেটে যায় দু-তিনটে দিন। পিকনিকেও যোগ দেন অনেক সংখ্যক পরিবার। আনন্দে মজায় কাটে জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় রবিবারটি। অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলিও হয় অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও আনন্দময়।

এখন 'আত্মজা'র অনেক বাচ্চাই বেশ বড় হয়ে গেছে। স্কুলের গণ্ডি ছাড়িয়ে তারা উচ্চশিক্ষায় রত। অনেকেই অন্যান্য প্রদেশে পড়তে গেছে। ফলে নিয়মিতভাবে হয়তো তারা সব অনুষ্ঠানে আসতে পারে না। তবে আমি নিশ্চিত, যে তাদের মন পড়ে থাকে 'আত্মজা'য়, বন্ধুদের জন্য।

কয়েক বছর আগে আমরা 'দশম বর্ষপূর্তি' অনুষ্ঠান পালন করেছিলাম হইহই করে। বাচ্চাদের সঙ্গে বাবা-মায়েরাও অংশ নিয়েছিলেন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। গানে-গল্পে-নাটকে-আড্ডায় দারুণ কেটেছিল দিনটা। আর প্রস্তুতি পর্বের রিহার্সাল-এর দিনগুলো তো ভোলা যায় না। আমাদের আশা, 'আত্মজা'র যখন রজত জয়ন্তী (২৫ বছর) হবে, তখন আমাদের ছেলেমেয়েরা এবং তখনকার নবীন বাবা-মায়েরা দায়িত্ব নিয়ে ধূমধাম করে পালন করবেন বছরটা। সঙ্গে থাকব আমরাও। 'আত্মজা'র সদস্য সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। আমাদের স্বপ্ন, ক্রমে সমস্ত দত্তক-সন্তানের বাবা-মায়েরা আসবেন 'আত্মজা'র ছাতার তলায়। আমরা ক্রমশ প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে যাচ্ছি। নতুনরা এসে হাল ধরবেন 'আত্মজা'র। মিলে মিশে সমাধান করবেন যে কোন সমস্যার। আজকের শিশুরা কালকে হয়ে উঠবে কিশোর-কিশোরী। তারা 'আত্মজা'য় এসে খুঁজে পাবে তাদেরই মতো অনেককে। আর একই ছাতার নিচে 'আত্মজা'র বিশাল পরিবার ক্রমেই আরও বড় হয়ে উঠবে।

সকলের জন্য রইল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

মেয়াদ শেষের প্রলাপ

অনুপ দেওয়ানজী

জন্মগ্রহণের সাত বছর পরে 'আত্মজা' যখন আমার কার্যকরী সম্পাদনার দায়িত্বে এসে পড়ল, তখন তার সবেমাত্র সাবালকত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে। 'আত্মজা'কে সেই অবস্থায় উন্নীত করার পুরো কৃতিত্ব আমার পূর্বসূরী শ্রী স্বপন নস্কর এবং শ্রীমতি সীমন্তিকা নাগের। সংগঠনের সর্বোপরি দায়িত্বে ছিলেন সভানেত্রী শ্রীমতি নীলাঞ্জনা গুপ্ত। এদের সকলের দক্ষ পরিচালনায় এবং আর সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় 'আত্মজা' জন্মলগ্ন থেকে বৃদ্ধি পেতে থাকল। আমি যখন তাকে হাতে পেলাম, তখন সে লালন পালনের ঊর্ধ্বে; সে তখন শক্তিশালী, প্রাণোচ্ছল কৈশোরে উত্তীর্ণ। যদিও তখনও তার দাড়ি-গোঁফ গজায়নি, কিন্তু তার লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়ে গেছে এবং সে স্থিতিশীল গতিতে এগিয়ে চলেছে তার লক্ষ্যপূরণের দিকে। অবশ্য তখন তার বয়ঃসন্ধিকালের কিছু কিছু সমস্যা দেখা দিলেও, যথাশীঘ্র তাদের সমাধানসূত্র বের করে 'আত্মজা' তার পূর্ণাবয়ব ধারণ করার জন্য প্রস্তুত।

এমতাবস্থায় আমি 'আত্মজা'র দায়িত্বভার গ্রহণ করলাম ২০০৭-এর এপ্রিল মাসে, মাথার উপরে পেলাম সভানেত্রী নীলাঞ্জনা গুপ্তকে এবং সহসভাপতি স্বপন নস্করকে, আর সঙ্গে পেলাম সহসম্পাদক শঙ্কর নস্কর এবং কোষাধ্যক্ষ ও হিসাবরক্ষক সঞ্জয় শিকদারকে। পেলাম আরও বেশ কয়েকজন সহযোদ্ধাকে, যাঁরা কার্যকরী সমিতির সভ্য হিসাবে আমাকে নানা বিষয়ে জ্ঞান দেওয়া ও সহায়তা করার জন্য বহাল হয়েছিলেন। আমি মনে করলাম যে আমার প্রধান দায়িত্ব সেটা নিশ্চিত করা যেন 'আত্মজা' পিছু হাঁটতে শুরু না করে; সে যেন বরং আরও এগিয়ে যেতে পারে লক্ষ্যমাত্রার দিকে। দাড়ি-গোঁফ গজানোর সাথে সাথে সে যাতে কৈশোর ত্যাগ করে যৌবনের পথে সুস্থভাবে উত্তীর্ণ হতে পারে, জ্ঞানবৃদ্ধির সাথে সাথে সে যাতে তার কর্মবিস্তার ঘটাতে পারে। শুনতে সহজ ও স্বাভাবিক মনে হলেও, তা ছিল কিন্তু বেশ কঠিন সাধনা। আমাদের সীমিত সময় ও ক্ষমতার মধ্যে তার অংশমাত্র বাস্তবায়িত করতে পারলেও 'কিছু পেরেছি' বলে আত্মতুষ্ঠ হতে পারি, সে রকম মনোবাসনা নিয়ে যাত্রা শুরু করলাম। সাথে ছিল পূর্বসূরীদের দেখানো নিশানা, সহযোদ্ধাদের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি, আর নিজের সর্বোত্তম প্রচেষ্টার মানসিক সংকল্প।

এতখানি প্রলাপের পর মনে হল আমাদের লক্ষ্যমাত্রা কি, তা নিয়ে তো সঠিকভাবে কিছু লিখলাম না। তবে আশা করি যেহেতু অধিকাংশ পাঠকরাই আমাদের সভ্য বা সমর্থক, অত্যন্ত সমঝদার, তাদেরকে আর নতুন করে 'আত্মজা'র লক্ষ্যমাত্রা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। মূলকথা এই যে (১) 'আত্মজা'র বংশবৃদ্ধি করা (২) 'আত্মজা'র সভ্যদের আস্ফালন সহকারে আত্মসমালোচনা ও বিনোদনের যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি করা (৩) দিকে দিকে ভদ্রসমাজে 'আত্মজা'র নাম ছড়িয়ে দেওয়া, এবং (৪) 'আত্মজা'র দ্বারা ইচ্ছুক পিতামাতাকে পালিত সন্তান গ্রহণে সহায়তা ও জ্ঞানদান করা।

সুধী ও শুভানুধ্যায়ী পাঠককুল, আপনারাই বিচার করুন যে এহেন লক্ষ্যমাত্রা পূরণের দায়িত্বভার গ্রহণ করা আমার নিজেরই নিজের পশ্চাৎদেশে বংশাঘাত করার সামিল কিনা। বিশেষ করে যখন আমার গৃহে ও কর্মস্থলে উভয়ক্ষেত্রেই কার্যভার বেশ প্রবলভাবে বিদ্যমান। কিন্তু তখন তো আমি সহযোগীদের প্রশংসাবাক্যে অন্ধ, আত্মশ্লাঘায় তুষ্ট, দায়িত্বভার গ্রহণে উন্মুখ এবং আত্মসম্মানজ্ঞানে পরিপূর্ণ। আসন্ন বংশাঘাত এবং সমালোচনার শরবৃষ্টি সম্বন্ধে আদৌ ওয়াকিবহাল নই। সম্যক জ্ঞান ও বোধোদয় হল তো অনেক পরে; প্রায়

আটবছর লাগল সেই বংশাঘাতের গণ্ডারের চামড়া ভেদ করে স্নায়ুকে স্পর্শ করতে এবং সেই সমালোচনা কানের পর্দা অতিক্রম করে মরমে প্রবেশ করতে। তবে লজ্জা বা আত্মগ্লানি নামক অনুভূতির কোনও জায়গা ছিল না। মনের আনন্দে ও উত্তেজনায় দায়িত্বভার বহন করে গেছি। যেদিন মনে হয়েছে যে আমি দায়িত্বভারে প্রায় নুব্জ হয়ে পড়েছি, সেদিনই কার্যকরী সমিতির কাছে প্রস্তাব দিয়েছি বিকল্প কাউকে খুঁজে বার করার জন্য। তবে কাজ করার আনন্দে কোনও খামতি নেই, সব কিছু ছেড়ে সন্ন্যাস নেওয়ারও কোন তাগিদ নেই। নতুন যিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন, শ্রী সুবীর ব্যানার্জীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই এবং জানাই পূর্ণ সহযোগিতার আন্তরিক প্রতিশ্রুতি।

এ যাবৎ লেখাগুলো পাঠককুলের কাছে খাপছাড়া প্রলাপ মনে হলেও, আমি কিন্তু মনে মনে একটা গঠন ও বাঁধন মেনে চলেছি। প্রলাপেরও সূত্র আছে। পাঠককুলকে আমার আটবছর মেয়াদের শুষ্ক কার্যবিবরণী অহেতুক বিরক্ত করেনি। নতুন কার্যকরী সম্পাদককেও ভয় পাইয়ে দিতে চাই না। 'আত্মজা'কে যৌবনে পৌঁছে দিতে পেরেছি কিনা জানি না—আজকাল চেহারা দেখে বয়স বোঝা, বা সে জীবনের কোন ধাপে আছে তা হৃদয়ঙ্গম করা বেশ মুশকিল, বিশেষ করে যখন তার আনুমানিক আয়ুষ্কাল নিয়ে কোনও ধারণা নেই কিন্তু দাড়ি-গোঁফ কিছুটা গজিয়ে দিতে পেরেছি বলে দাবি করছি। আর যেটুকু পেরেছি, তার কৃতিত্ব আমার একার নয়। আরও একটা ব্যাপারে সম্যক জ্ঞান হল।

> *'কর্তব্যপূরণের আনন্দে কাজ কর, ফলের অপেক্ষা না করেই এবং সমালোচনায় নিরুত্তর থেকে। তাহলে কিঞ্চিৎ হলেও সফলতা জুটবে, কিছুটা হলেও অগ্রগতি ঘটবে।'*

আশা করি এই জ্ঞানের বাণীটুকু নতুন সম্পাদকের চলার পথে পাথেয় হতে পারবে, 'আত্মজা' দীর্ঘজীবী হোক।